

# বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার

মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ

চতুর্থ সংকলন

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯

দাম : পঞ্চাশ পয়সা

- গাঙ্গেয় অববাহিকায় বন্যাসমস্যা—২ ● সিমেন্সের খপ্পরে ভেল ( BHEL )—বিকাশের পথে না বিনাশের ?—১২  
● এনসেফেলাইটিস—১৪ ● টেষ্টটুবে বেবি বিতর্ক : কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য—১৫ ● সংস্থা সংবাদ—১৯

## সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয়ের ফলে পশ্চিমবাংলা সহ দেশের অগ্রাঙ্ক রাজ্যে জনমত যথেষ্ট নাড়া খেয়েছে। বহু দেশের অগ্রগতির ইতিহাস থেকে আজ এটা বাস্তব সত্য হিসেবে বেরিয়ে এসেছে যে সুদূর বিজ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে এসব বিপর্যয় এবং তার অবশ্যস্বাভাবী ফলশ্রুতি সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখহর্দগার স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব। অনেক দেরিতে হলেও তাই বিজ্ঞান প্রয়োগের সমস্যাগুলো নিয়ে, বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ও প্রতিবন্ধকগুলো সম্পর্কে আজ কিছুটা গভীর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। অবশ্য সমস্ত আলোচনা এখনও সীমিত থাকছে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এবং তা হচ্ছে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে—কাজে রূপ দেবার উপযুক্ত কোন স্পষ্ট কর্মসূচী বা পরিচলনাকারে তা বেরিয়ে আসছে না। ব্যাপক জন্মসাধারণ এখনও নিয়তিবাদী নিষ্ক্রিয়তার খপ্পরে। তাতে চিন্তায় অপেক্ষাকৃত এগিয়ে-থাকা অংশটিও মনোবল ও উৎসাহ পাচ্ছেন না—গণ উত্তোগ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মূল্য খুঁজে না পেয়ে নানা সংশয় ও দ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছেন। এ থেকে আসছে আলোচনাবিমুখতা, নিষ্চেষ্টতা এবং সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাবার বিপজ্জনক প্রবণতা—যার অনিবার্য পরিণাম বিহীন শক্তির কাছ আরো অপমানজনক আত্মসমর্পণ। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তত্ত্বগত চিন্তার সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ ও কষ্টকর। কিন্তু তা কষ্টকর বলেই, এতে সহজ-সাফল্য নেই বলেই সব প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার অর্থ সাময়িক ব্যর্থতাবোধ থেকে বৃহত্তর বিপর্যয়ের দিকে পা বাড়ানো।

স্বাভাবিকভাবেই আমরা তা হতে দিতে চাই না। তাই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা গত ১৬ই ডিসেম্বর ( '৭৮ ) বিকেলে দ্বারভাঙ্গা হলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাথে যৌথ উত্তোগে এবারের ভয়াল বন্যা প্রসঙ্গে এক শিক্ষামূলক আলোচনাচক্র সংগঠিত করেছিল। অগ্রাঙ্ক বন্ধু সংগঠনগুলোকেও আমরা অল্পরূপ বা আরো গঠনমূলক উত্তোগ গ্রহণে ব্রতী হতে আহ্বান জানাই। আলোচনা-সর্বস্বতা নিষ্ক্রমই এসবের লক্ষ্য হবে না—কিন্তু তুললে চলবে না যে আলোচনা বাদ দিয়ে কোন বিষয়েই আলোর সন্ধান সম্ভব নয়।

আলোচনা হচ্ছে, হবে—বহুমুখী চেষ্টা চলেছে, চলবে। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কোন্ পথে চলেছি ? 'উন্নত' দেশগুলোর সঙ্গে তথাকথিত 'সহযোগিতা'র কর্মসূচীতে কি আমাদের স্বনির্ভরতাই ক্রমাগত বিপন্ন হচ্ছে না ? বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সার্ব-কমিশনের দুদিনব্যাপী [ নভেম্বর ২-১০, ১৯৭৮ ] অহুষ্ঠিত অধিবেশন এসব প্রশ্ন সজোরে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়োজনে, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী প্রণয়নের কাজে আজও কি আমাদের ঘটা করে শলা-পরামর্শ করতে হবে বিদেশী 'বিশেষজ্ঞ'দের সাথে ? গত তিরিশ বছরে তাহলে এ কেমন ধরনের স্বনির্ভরতার বিকাশ ঘটল ? যারা এদেশের জনগণের সমস্যা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ ভাষা-ব্যবহার-অনুভব সম্পর্কে অজ্ঞ তাঁদের পক্ষে আমাদের প্রকৃত উন্নতির চাবিকাঠি নির্ণয় করে দেওয়া কিভাবে সম্ভব ? আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের 'নাহায্য' শলাপরামর্শের আড়ালে ষট বিদেশী বণিক স্বার্থের অবাঞ্ছিত অহুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ।

বর্তমান ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের আপন-ভোলা মেতা-বিজ্ঞানীরা এসব তুচ্ছ (?) ব্যাপার নিয়ে মাথা ঝামা ঝা—  
কেননা ঝামা বিপদ। মনে রাখবেন—আমার আপনার নীরবতা ও ঔদাসীন্য এদের যথেষ্টাচারের আলামি হিসেবে কাজ করে—তাই বিজ্ঞানের  
বিলাসী বৈজ্ঞানিকদের দুনিয়া ছেড়ে পর্বস্তরের বিজ্ঞানকর্মীদের আজ সচেতন, সক্রিয় ও লংগঠিত হওয়া বড় প্রয়োজন।

আমাদের সংগঠন ও পত্রিকার উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে যথাসম্ভব সাহায্য করা। বহুজনিত ধ্বংস ও মৃত্যু এড়াতে 'কেন এই বন্যা'-র  
পোস্টমর্টেম খুবই জরুরী। এ নিয়ে মতামত সৃষ্টির মানসেই বহু সংক্রান্ত প্রথম লেখাটি এখানে প্রকাশ করা হল। তাছাড়া কলকাতার টেট  
টিউব বেবি, এনসেফেলাইটিস নিয়েও সমাজ এবং বিজ্ঞান কতগুলো প্রশ্নজালে জড়িয়ে পড়েছে। কেরালায় আন্দোলন এবং সিমেন্টের সঙ্গে তেল-এর  
চুক্তির ফলাফলও হৃদয়প্রসারী হতে বাধ্য—তাই এসব সময়োপযোগী লেখাগুলো এবারে পরিবেশন করা হল। সব লেখা সম্পর্কেই আমরা পাঠকের  
মতামত ও সমালোচনা বিশেষ ভাবে আহ্বান করছি।

## গাঙ্গেয় অববাহিকায় বন্যাসমস্য

“ও গঙ্গা! তুমি বইছ কেন?”

[The problem of flood in West Bengal, in particular that of the lower Gangetic basin, is presented. The geographical and natural features of this region are presented in the first part. The second part deals with the problems generated through human interferences on the river system. The much debated multipurpose D.V.C. and Farakka Barrage Projects will be discussed in a later article.]

১৯৭৮ সালে সারা দেশ জুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়, যে সর্বনাশা  
বন্যা হয়ে গেল তা আজ মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে—প্রশ্ন  
উঠেছে কতটা এই বন্যার জন্ত দায় প্রবল বর্ষণের তীব্রতা ও ঘূর্ণিঝড়,  
কতটা দায় এই অঞ্চলের নদনদীর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আর কতখানিই  
বা এই বন্যা মানুষের হাতে গড়া? প্রাকৃতিক ও পরবর্তীকালীন নদী  
ব্যবস্থাপনার অপরিপূর্ণতা, গৈখিল্য ও ভ্রাস্তি নিয়েও প্রশ্ন আছে। পশ্চিম-  
বাংলার নদনদীর ভূপ্রাকৃতিক সমস্যা, নদীকে নিচে, নদীর ওপর ও নদীকে  
ধীরে নানা প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক  
মিলিয়ে সামগ্রিকভাবেই এই সমস্যার বিচার করা প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধের প্রথমার্শে আমরা মূলত গাঙ্গেয় অববাহিকার নিম্ন  
পশ্চিমাঞ্চলের বন্যা সমস্যার স্বরূপ ও সে সমস্যায় এই অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক  
বৈশিষ্ট্যের অবদানের দিক নিয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয়াংশে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন স্বার্থস্বার্থী গোষ্ঠী  
স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কিভাবে এই অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে  
নদী স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়েছে ও এই অঞ্চলের বন্যা সমস্যাকে আরও  
ব্যাপক ও শোচনীয় করে তুলেছে। এই অংশের আলোচনায় সমস্যার  
একটা রূপরেখা পাওয়া যাবে মাত্র কেননা এই সমস্যায় বৈজ্ঞানিক বিচার  
ত' দু'বের কথা বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা হবে কিছু কিছু শুরু হয়েছে।

পরবর্তী সংখ্যায় এই প্রবন্ধের তৃতীয়াংশে আমরা দামোদর উপত্যকা

পরিকল্পনা ও ফরাক্ক ব্যারাজ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করব। নিম্নগাঙ্গেয়  
অঞ্চলের বন্যাসমস্যার যে যে দিকগুলো নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা  
করছি সেই সমস্ত সমাধানে এই প্রকল্পগুলো কতটা সহায়তা করেছে অথবা  
সেই সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে কি না, সামগ্রিক বিচারে এই প্রকল্পগুলো  
কতটা কল্যাণকর তাই হবে আমাদের আলোচনার বিষয়। এই প্রসঙ্গে  
একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন প্রকল্পের সাফল্য, ব্যর্থতা  
বা প্রভাব বিচারের মূল্য সামান্যই—নদনদীর ব্যাপারে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর  
পরিবর্তে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা ও প্রকল্প গড়ার ফলেই যে তা থেকে  
অশুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলার বীজ পুতে রাখা হয় তাই  
আমরা তুল ধরার চেষ্টা করব।

### নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকার নদনদী, ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বন্যাসমস্যার বিবরণ:

গঙ্গা-পদ্মাই এ অঞ্চলের মূল নদী। পশ্চিমাংশের নদীগুলি ছোটনাগপুর-  
স ও তাল পরগণার পার্বত্য এলাকায় জন্ম নিয়ে গঙ্গার শাখা ভাগীতী-  
হুগলীতে মিশেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ভাগীরথীকে গঙ্গার এই উপনদী-  
গুলি যথাক্রমে মৌর বা ময়ূক্ষী, অঙ্গর, দামোদর, দ্বারকেশ্বর (ঢালকিশোর)  
শিলাই (শিলাবতী), সুবর্ণরেখা, কাঁসাই (কংসাবতী), হলদি। অত্রদিকে  
পশ্চিম থেকে পূবে পরপর উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গাপদ্মার প্রধান উপনদী-

গুলো হ'ল : মহানন্দা-পুনর্ভবা, আত্রাই, ষমুনা-নাগর-বরাল, করতোয়া।  
 তিস্তা মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সাথে। এই সমস্ত উপনদীগুলোর নিজেদের  
 উপনদী ও শাখাপ্রশাখা আছে। গঙ্গা বা পদ্মার প্রধান শাখানদী ভাগীরথী

হুগলী, অত্রাত শাখানদীগুলোর মধ্যে আছে ভৈরব-জনকী, মাথাভাঙ্গা-চুপী  
 ভৈরব, গড়াই, কুমার, বারাসিয়া, নবগঙ্গা, মধুমতী প্রভৃতি (শেষের পাঁচটি  
 পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত), (চিত্র নিচে দেওয়া হল।)



[ সূত্র : বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা : কপিল ভট্টাচার্য্য : বিজ্ঞানদায়  
 লাইব্রেরী আইভেট লিঃ, নভে: ১৯৫৯ : চিত্র নং ৬ ]

ভাগীরথী হুগলীর অববাহিকার বন্যপ্রাণিত গড় এলাকা প্রায় ছ হাজার  
 বর্গ কি. মি.। গঙ্গা ও পদ্মা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ভাগীরথী  
 হুগলীর নদী স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটেছে। সম্ভাব্য বন্য প্রাণিত এলাকা

বেড়েই চলেছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি প্লাবনের পরিসীমা রেখা  
 ( contour line ) ছিল ৫৫ ফুট, ষাটের দশকের শেষদিকে ৩৫ ফুট এবং  
 বর্তমানে তা ৮৫ ফুট। নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার মূল ভূপ্রাকৃতিক

সমস্যাগুলো আমরা নিচে আলোচনা করব।

**পলিপতন সমস্যা:** ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমাংশের উপনদীগুলি ধরসোতা নদী। এদের বৈশিষ্ট্য হল প্রচুর ও অনিয়মিত পলিপতন এবং নদীখাত বৃদ্ধির (scouring) প্রবণতা। বহুমানগুলোতে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর প্রভৃতি উপনদীতে পলিপূর্ণ জলের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ভাগীরথীর অপেক্ষাকৃত কম জলপ্রবাহের ফলে আঞ্চলিক জলনির্গম ক্ষমতা কমে গিয়ে প্রাবন সমস্যার সৃষ্টি হয়। উপরন্তু পলিপতনের ফলে ঐশব উপনদীগুলিও ক্রমশঃ মজে যাচ্ছে—এই পলিপতনের কারণ হিসেবে বলা চলে: ১। উচ্চ আবহাওয়ারের ঢাল বেশি থাকায় বাটতি বহুবার (flash flood) সময় জলপ্রবাহের মাত্রা বেশি হয়, তার ফলে ভূমিক্ষয় বেশি হয় এবং ক্ষয়িত পলিবালি নিম্নপ্রবাহে নদীবক্ষে জমা হয়। নিম্নপ্রবাহে নদীর ঢাল কম থাকায় জলের গতিও কমে যায়, তার ফলে পলিপতন আরো বৃদ্ধি পায়। পরিণতি হিসেবে নিম্নপ্রবাহে নদীখাত মজে যেতে থাকে এবং এই অঞ্চলের প্রাবনতলের (flood plain) থেকেও নদীবক্ষ উচু হয়ে পড়াতে বহুসম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে তোলে। ২। জমির জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে যাওয়ায় নিম্নাঞ্চলের কম ঢালে ক্রমশঃ অধঃক্ষেপন বাড়ে। ৩। বর্ষার শেষে শরতের গোড়ায় হুগলী ও রূপনারায়ণে মৌসুমী কোটাল বা বান ডাকে। ফলে নদীগুলির সমুদ্রগ্রামী পথ বাধা পায় ও জলনিকাশে বাধা পাওয়ায় পলিপতন বেড়ে যায়।

**জলমগ্নতার সমস্যা:** সাধারণতঃ অবনত ভূতলেই জলমগ্নতার সমস্যা দেখা দেয়। নিম্ন দামোদরের বেশ কিছু অঞ্চলে এরকম জলমগ্নতার সমস্যা আছে। বর্ধমানের পশ্চিমে ভূগর্ভস্থ জলতল (ground water table) ভূতলের অনেক নিচে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সাথে জলতলের উচ্চতা কম বেশি হয়, যদিও আশেপাশের জল ও এই বৃষ্টিপাতের সাথে যুক্ত হয়ে জলতলকে আরও উচু করে তোলে।

**বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিঝড়:** ভাগীরথী হুগলী অববাহিকা অঞ্চলে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিঝড় ও নিম্নচাপের ফলে প্রবল বর্ষণ হয়। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, যদিও অববাহিকার সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক নয়। এই অববাহিকায় ঘূর্ণিঝড় ও নদীপ্রবাহ বিপরীতমুখী, ফলে ঝড়ের চলে যাবার বেগ মন্দীভূত হয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে এবং উচ্চ আবহাওয়ার থেকে তীব্র বর্ষণের ফলে নিম্ন অঞ্চলের প্রাবন তলের ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। গত পঞ্চাশ ষাট বছরের বৃষ্টিপাতের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এর কোনো ক্রমাগত বেড়ে ওঠা বা কমে যাওয়ার ঝোক নেই—বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ অনিয়মিত এবং এর কোনো পর্যায়কালও নেই। ভাগীরথী হুগলীর আবহাওয়ারে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১০ সে.মি. থেকে ১৫০ সে.মি. (বার্ষিক)। ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও কাঁসাইয়ের উচ্চ আবহাওয়ারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫ সে. মি.-এর কম। নিম্নাঞ্চলে

বেশি বৃষ্টিপাতের কারণ হল জলীয় বাষ্পের কাঁচাকাঁচি এদের অবস্থান ও আঞ্চলিক বাত। বেশিরভাগ প্রাবনই জুন থেকে সেপ্টেম্বরে হয়ে থাকে।

### তুলনামূলক বৃষ্টিপাত: এবারের সর্বনাশা বহু

রাও-প্রামাণিকের অল্পসংখ্যক থেকে দামোদর আবহাওয়ারে ১৯১১-১৯৫০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তালিকা নিচে দেওয়া হল:

জলঝড়ের স্থায়িত্ব	সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত	জলঝড়ের স্থায়িত্ব	সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত
১ দিন	৪'২১" (১১'০৩ সে. মি)	৪ দিন	১০'৩৮" (২৬'৭৮ সে. মি.)
২ দিন	৭'৪০" (১৮'৫০ সে. মি)	৫ দিন	১১'১৮" (২৭'২৫ সে. মি)
৩ দিন	২'২১" (২৩'০০ সে. মি)	৬ দিন	১২'১২" (৩০'৫০ সে. মি)
		৭ দিন	১২'৩২" (৩০'৭৫ সে. মি)

এর সাথে রাও-প্রামাণিকের গবেষণা অস্থায়ী দামোদরের আবহাওয়ারে একহাজার বছরে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল:

জলঝড়ের স্থায়িত্ব	সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত	জলঝড়ের স্থায়িত্ব	সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত
১ দিন	৭'৭" (১৯'২৯ সে. মি)	৪ দিন	১৬'৩" (৪০'০৫ সে. মি)
২ দিন	১২'৩" (৩০'৭৫ সে. মি)	৫ দিন	১৭'২" (৪৩'০০ সে. মি)
৩ দিন	১৪'৬" (৩৬'৫০ সে. মি)	৬ দিন	১৭'৬" (৪৪'০০ সে. মি)
		৭ দিন	১৮'২" (৪৫'৫০ সে. মি)

এবারের বহু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আলিপুরের রেকর্ড থেকে দেখা যায়:

তারিখ (১৯৭৮ সাল)	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সে. মি.)	তারিখ	মোট বৃষ্টিপাত (১৯৭৮) (সে. মি.)	স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (সে. মি.)
২৬ মে:	০'৩৭			
২৭ মে:	২২'৩২			
২৮ মে:	৩৬'২৬	১লা জুন থেকে	১২২'০৫	১২০'৮০
২৯ মে:	১২'২৩	৩০ মে:		
৩০ মে:	০'৪২			

ওপরের তালিকা থেকে যদিও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৮ সালে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, এমনকি হাজার বছরের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের তুলনায়ও অনেক বেশি, তাও এই অভাবনীয় বর্ষণের তীব্রতাই বহু প্রাধান কারণ হিসেবে মনে করলে ভুল হবে কারণ যদি উপযুক্ত বহু নিরোধকারী ব্যবস্থা থাকে, যদি জলনিকাশী ব্যবস্থা ও জলপরিবহন ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে তা হলে এই প্রবল বৃষ্টির সর্বনাশা বহু নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ভাগীরথী হুগলী অববাহিকার বহুসংখ্যক ভূপ্রাকৃতিক অবদানগুলো সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল :

- ১। উচ্চপ্রবাহে বাহিত পলির পরিমাণের তারতম্য, প্রচুর পলিপতনের ফলে নদীখাত মজে যাওয়া ও তার ফলে নদীর জলপরিবহন ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- ২। নদীগুলিতে অনিয়মিত জলপ্রবাহের মাত্রা—জুন থেকে আগস্টে মোট বার্ষিক শতকরা ৮০ ভাগ প্রবাহ।
- ৩। জলায়ুর বৈশিষ্ট্য যেমন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টিপাতের তীব্রতা।
- ৪। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এবং অক্টোবরের প্রথম দিকে প্রবল বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড় এবং একই সময়ে মৌসুমী কোটাল বা বান ডাকা।
- ৫। কতকগুলি নিম্নাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী জলমগ্নতা।
- ৬। সাধারণভাবে তলনিকশী ব্যবস্থার অভাব।
- ৭। নদীর সপিল গতিপথের পরিবর্তন।
- ৮। জোয়ার ভাঁটা খেলা নদীর নিম্নাঞ্চলে পলিজমার বিশেষ সমস্যা—

যার ফলে নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে ক্রমশঃ চড়া ওপর দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। এই বিষয়ে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে<sup>১</sup>, যেমন—

ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর, দারকা ও মধুবাণী একত্রে যে বহুসংখ্যক জল বহন করে তা বাবলা ও তার শাখাপ্রশাখা দিয়ে প্রবাহিত হবার কথা কিন্তু পলি জমে বাবলার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এ অঞ্চলে প্লাবন হয়।

কালনা, পূর্বস্থলী নবদ্বীপ এলাকায় প্লাবনের কারণ প্রবল বর্ষা, ভাগীরথীর জোয়ারের জলক্ষীতি এবং ভাগীরথীর সপিল গতিপথের পরিবর্তন। এ ছাড়াও জলনির্গম পথ কম থাকায় এবং সে পথেরও জলনিকশী ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে এ অঞ্চলে জলমগ্নতার সমস্যা দেখা দেয়।

দামোদর হুগলীর দুপাশে বারংবার প্লাবনের কারণ হল এ অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক অবনতি ও পরিত্যক্ত নদীপথগুলির মুমূর্ষু জলনিকশী ক্ষমতা। রূপনারায়ন, হুগলী আর হলদি নদী মজে যাওয়ায় এবং এর সাথে জোয়ারের বিপর্যয়মূলী জলস্তম্ভের বাধায় ( Tidal lockage ) তমলুকে প্লাবন ঘটে থাকে।

### তিনটি বিশেষ নদী : অজয়, রূপনারায়ণ ও দামোদর

এই অঞ্চলের বহুসংখ্যক যে তিনটি বিশেষ নদী কুখ্যাতি অর্জন করেছে এবারে আমরা তাদের গতিপ্রকৃতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

#### অজয় নদের সমস্যা :

রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ থেকে বেড়িয়ে অজয় নদ বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে। ৩৭৩০ বর্গ কি. মি.

আবহক্ষেত্রযুক্ত অতি ঢালবিশিষ্ট এই নদ বৃহৎ সেচ এলাকাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। অজয়ের উচ্চ আবহক্ষেত্র থেকে লালপাথুরে মাটি ক্ষয়িত হয়ে জনশ্রোতে ভেসে ভাগীরথীতে অধঃক্ষিপ্ত হচ্ছে এর ফলে হালিশহরের কাছে চড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

বর্ষাকালে এর প্রবাহমাত্রা সাধারণত ৩ লক্ষ থেকে ১ হাজার কিউসেকের ওঠানামা করে। ১৯৬২ সালে গুসকরাতে মেপে দেখা গেছে অজয়ের প্রবাহমাত্রা ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার কিউসেক। এ বছর (১৯৭৮) গুসকরাতেই প্লাবন হয়ে গেছে। কাটোয়াতে ভাগীরথীর জলবহন ক্ষমতা এ সময় দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ কিউসেক। প্লাবনের সাথে সাথে হুগলী মোহনার মুখেও পলি জমার সম্ভাবনা বাড়ে। অজয়ের জলবহন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় নিম্ন হুগলীর জল অপসারণ ক্ষমতাও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

#### রূপনারায়ণের সমস্যা :

শিলাই ও দ্বারকেশ্বর নদী দুটির সংযোগে মাটাল থেকে নদীর এই নাম। ভাগীরথী রূপনারায়ণের মোহনায় লম্বভাবে এসে পড়েছে। বৃষ্টিপ আমল থেকে রূপনারায়ণের এই মোহনার নাম হয়েছে নিম্ন-হুগলী। রূপনারায়ণের গুরুত্বের কয়েকটা দিক : \*

১। বঙ্গোপসাগর থেকে হুগলী খাঁড়িতে যে বানের তোড় প্রবেশ করে তা প্রথম বাধা পায় এই নদের গৈয়োখালি অঞ্চলে। এ না হলে জোয়ারের উচ্চাঙ্গ আরও উত্তর অবধি পৌঁছত।

২। এই নদ বর্তমানে মুণ্ডেশ্বরীর মাধ্যমে দামোদরের বহুসংখ্যক জল ধারণ করে নিম্নদামোদরে প্লাবন বিধ্বংসীতা কমাতে সাহায্য করে।

৩। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও মেদিনীপুরের দুই তীরবর্তী প্রায় ৫ লক্ষ একর বিস্তৃত অঞ্চলের জল এতে এসে পড়ে। কাজেই ছোটনাগপুর উপত্যকার পূর্ব দক্ষিণাংশের প্রায় সমস্ত বৃষ্টির জলই বহুরূপে রূপনারায়ণের খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিম্নহুগলীর সমুদ্র খাঁড়িতে প্রবেশ করে।

সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, ১৯৩৮-'৫৩ সাল পর্যন্ত রূপনারায়ণের জল-প্রবাহের ঘনত্ব মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু ১৯৫৫-'৬২র মধ্যে এটা কমেছে ১% এবং ১৯৬২-'৬৪তে ২%। ( প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভি. ভি. দির বাঁধগুলি কার্যকরী হয় ১৯৫৮ সালে )।

#### এ সবে পরিণতি হল :

১। হুগলী প্রণালী পেরিয়ে হুগলীর মুখে জোয়ারের বেগবৃদ্ধি এবং তারফলে ভাগীরথী-হুগলীতে জোয়ারের বিস্তৃতি ও উর্ধ্বমুখিতা বৃদ্ধি।

২। পূর্বে বহুসংখ্যক ঋতুতে ভাগীরথী হুগলীতে যে সব পলিমাটি ও বালি জমা হত পরবর্তী বহুসংখ্যক তা ভেসে যেত সমুদ্রে। কিন্তু নিয়মিত ধারায়

প্রাবল্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়াতে সেগুলো সমুদ্রে ভেসে না গিয়ে ক্রমশঃ ওপরের অঞ্চলে অধঃক্ষিপ্ত হতে থাকে।

৩। ক্রমশঃ কলকাতা বন্দর ও নিম্নভাগের নাব্যতা কমে যাচ্ছে এবং জলের লবণাক্ততাও বাড়ছে।

৪। নিম্নদামোদর ও দ্বারক্ষেত্রের বর্ষার জল নির্ধারী পথ ক্রমেই বেশি-মাত্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আস্তদামোদর ও আরামবাগ অঞ্চল প্রাবিত হচ্ছে, ফলে জলমগ্নতাও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

### দামোদর নদের সমস্যা :

ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে দক্ষিণ পূর্ব বরাবর নেমে আসা এই নদের সাড়ে আট হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্রের মধ্যে দামোদর ও বরাকরের সমন্বয় পর্বত শঙ্কু আকৃতি উচ্চ উপত্যকার ক্ষেত্র প্রায় সাত হাজার বর্গমাইল। উচ্চপ্রবাহের পর দামোদর পশ্চিমবঙ্গে পূর্বমুখী গতিতে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছেছে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি—এই হল দামোদরের মধ্যপ্রবাহ। বর্ধমানের পনেরো মাইল দক্ষিণপূর্বে টাটাই গ্রামের কাছে দামোদর প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী গতি নিয়েছে এবং কলকাতার তিরিশ মাইল দক্ষিণে নিম্নভাগে বোহায়ায় মিশেছে। বর্ধমান থেকে মোহনা পর্যন্ত গতিপথকে নিম্ন দামোদর বলা চলে। এই অঞ্চলে নদীর ঢাল খুবই কম (মাইল প্রতি এক ফুট মাত্র) অথচ উচ্চ-প্রবাহে প্রথম ১৫০ মাইলে নদীর ঢাল মাইল প্রতি বার ফুট প্রায়, পরবর্তী ১০০ মাইলে নদীর ঢাল মাইল প্রতি সাড়ে তিন ফুট। উচ্চ আবহক্ষেত্রের নমস্ত জল নির্গমের পথ হল ১৫৬ মাইল দীর্ঘ অপেক্ষাকৃত সরু মধ্য ও নিম্ন দামোদর। উচ্চ আবহক্ষেত্রে কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হলে সেই জলের শতকরা ২০ ভাগ জল দামোদর বরাকরের শঙ্কু শীর্ষ এসে মিলিত হয়, অথচ নিম্নদামোদরের পক্ষে এর অধিকের বেশি জলবহনের ক্ষমতা নেই। দুর্গাপুর ব্যারিজের নিচে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত জল পরিবহন মাত্রা ছিল আড়াই লক্ষ কিউসেক। এমনকি ১৯১৩ ও ১৯৩৫ সালে দামোদর-বরাকরের শঙ্কু শীর্ষ দিয়ে সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা ছিল সাড়ে ছয় লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি। ডঃ এন, কে, বসুর মতামতানুযায়ী ১৮২৩ সালের বর্ষায় প্রবাহমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ—দশ লক্ষ কিউসেকের ওপর। যদি ডি. ভি. সির বাঁধগুলোয় যে অংশ প্রশামিত হচ্ছে তা বাদ দেওয়া যায় তা হলে দুর্গাপুর ব্যারিজ দিয়ে ১৯৫৮ সালে সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা হত যথাক্রমে ২ লক্ষ ৪০ হাজার, ১ লক্ষ ২৫ হাজার, ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার কিউসেক (২৩-২৬শে জুলাই, ১১-১৪ আগস্ট, ১৪-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)। একইরকমভাবে অগ্রাঙ্ক বছরের ক্ষেত্রও ডি. ভি. সির বাঁধগুলোয় সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার প্রশমন বাদ দিলে মাইথন ও পাঞ্চেত উপত্যকা থেকে কতটা জল সর্বোচ্চ-প্রবাহমাত্রায় আসছে তা থেকে বর্ষা সময়ের কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।\*

সাল ও তারিখ	মাইথন ও পাঞ্চেত মোট-আগত জলের সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা (১০ <sup>৩</sup> কিউসেক)	নাল ও মাইথন ও পাঞ্চেত তারিখ মোট আগত জলের সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা (১০ <sup>৩</sup> কিউসেক)	
১৬/১৭-২-৫৮	৫৫৫	১২-৮-৬৬	৫৩
১/২-১০-৫৯	৬২৩	১২-৮-৬৭	২০০
২৭/২৮-২-৬০	৩৪৮	৪/৯-৭-৬৮	২৪৬
২/৩-১০-৬১	৫১৬	৯/১১-৮-৬৯	১৮৯
২২-২-৬২	১৫২	৩/৬-২-৭০	২৯২
২/৩-১০-৬২	৪৫১	১৬/১৮-৭-৭১	৪২৪
২৪/২৬-১০-৬৩	৪৬৪	১২/১৩-২-৭২	১২৪
৯/১০-২-৬৪	৮২	২৩/২৫-২-৭৩	২১১
২৯/৩০-৭-৬৫	৩৭৩	১২/১০-১০-৭৩	৫৮৮
		২৯/৩০-২-৭৪	২৩০

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার বছর-গুলোতেই (১৯৫৮, '৫৯, '৬১, '৬২, '৬৩, '৭১, '৭৩) প্রাবন ঘটেছে, হয়ত তাদের বিধ্বংসীতা কম বেশি হতে পারে। তবুও একথা মনে রাখতে হবে যে প্রাবনের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি শুধু সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা দিয়েই নির্ধারিত হয় না—কত আয়তনের জল (একর ফুট) কত সময় ধরে প্রবাহিত হচ্ছে সে হিসেবও প্রয়োজন।

[ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছাড়াও বর্ষার জল নদীতে পৃথকভাবে মাপা প্রয়োজন—একটা হিসেব করে দেখানো যায় যে দামোদরের উচ্চ উপত্যকার ৭ হাজার বর্গমাইলে প্রায় ৫" বৃষ্টিপাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হলেই ২৩ লক্ষ কিউসেকের বর্ষা দামোদরের নিম্নপ্রবাহে ২ দিনে নামবে। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে নিম্নভূমিতে যে বৃষ্টি হয়েছে তা ষোণ করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৬৩ লক্ষ কিউসেকের বর্ষা পাওয়া যেতে পারে যদি উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে ৪"/৫" বৃষ্টিপাত হয়। ]

দুর্গাপুরের কাছ দিয়ে বিভিন্ন বছরে দামোদরের বর্ষার সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা ও মোট আয়তনের হিসাব (একর-ফুট) দেওয়া হল।

বছর	সময়	বর্ষা : প্রবাহমাত্রা / মোট আয়তন ( হাইড্রোগ্রাফ )	
		সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা ( লক্ষ কিউসেক )	জল প্রবাহের মোট আয়তন ( দশলক্ষ একর ফুট )
১৯১৩	৬-১২ আগস্ট	৬.৫০	৩.২০
১৯৪৩	৩-১১ "	২.২৬	২.২০
১৯৫০	—	৩.৩৮	২.২০
১৯৫৬	২৫-৩০ সে:	৪.২০	০.২৮
১৯৫৯	৩০ সে:-৩ অ:	৮.১০	২.১০
১৯৭৮	২৭ সে: ১২ অ:	৩.৬৯	৩.৭০

দামোদরের প্লাবনের অত্যন্ত প্রধান কারণ হল এই নদের উচ্চ আবহক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন (মোট আবহক্ষেত্রের ৪/৫ অংশ)। এই আবহক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলকে ক্ষয় করে প্রচুর শিলা, বালি, মাটি বহন করে অপেক্ষাকৃত কম ঢালের মধ্য প্রবাহে নিয়ে আসে ও এখানে অধঃক্ষিপ্ত হয়। সেই সঙ্গে মধ্য ও নিম্নপ্রবাহের অপেক্ষাকৃত সরু প্রণালীর জল পরিবহন ক্ষমতা কম হওয়ায় মধ্য ও নিম্ন অঞ্চলের জলও এখানে এসে যুক্ত হয়। ১৯৫৯ সালে দুর্গাপুর ব্যারেজ দিয়ে সর্বোচ্চ প্রবাহ গেছে ৩.৫ লক্ষ কিউসেক। ঐ বছর একইসময় মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে নির্গত সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্র ছিল ২.৮ লক্ষ কিউসেক [মাইথন ও পাঞ্চেত আগত সর্বোচ্চ প্রবাহ (৩.৩৩ লক্ষ কিউসেক) বীধ দ্বারা প্রশমিত (৩.৩৫ লক্ষ কিউসেক) = ২.৮ লক্ষ কিউসেক]। কাজেই বাকি ৩.৫০ - ২.৮৮ = ০.৬২ লক্ষ কিউসেক জল হল মধ্য ও নিম্ন আবহক্ষেত্রের অবদান। এবারে (১৯৬৮) বলা হয়েছে বীধগুলি থেকে সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার জল ছাড়া হয়েছে ১.৬ লক্ষ কিউসেক। অর্থাৎ দুর্গাপুর ব্যারেজের কাছে সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা ছিল ৩.৭৯ লক্ষ কিউসেক। অর্থাৎ ৩.৭৯ - ১.৬০ = ২.১৯ লক্ষ কিউসেক জল ছিল এবারে দামোদরের মধ্য ও নিম্ন আবহক্ষেত্রের অবদান।

এর ওপর মনে রাখতে হবে দামোদর অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থা ক্রমেই দুর্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮র হিসাবে যেখানে বলা হয়েছে ২.৫ লক্ষ কিউসেক জলে দুর্গাপুর ব্যারেজের নীচে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে ১৯৭১ লালে শ্রী.ক. ভি. শ্রীনিবাস রাও-এর নেতৃত্বে ডি. ভি. সির একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে নিম্ন দামোদরে ২.৫ লক্ষের জায়গায় মাত্র ৬০,০০০ কিউসেকের বজার জলে চারদিক প্লাবিত হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের কয়েকটি ব্যারেজ ও হেবর (weir) পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে—এর উচ্চ অঞ্চলে প্রথম ৪-৫ বৎসরে পলিজমা শুরু হয় এবং নিম্নাঞ্চলে খাত গভীরতর হয়। তারপরের পরে উচ্চপ্রবাহে ঝলপলি অধঃক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং নিম্নাঞ্চলেই অধিকাংশ পলি এসে জমা হয়ে এবারে নিম্নাঞ্চলকেই উন্নত করতে থাকে—এর ফলে খালের নতির গড় কমে যায় (aggradation)।

নীচে ডি. ভি. সি. বীধগুলো থেকে সুরেকালনা পর্যন্ত নদী ও খালের বক্ষোন্নতির একটা তালিকা দেওয়া হল।

অঞ্চল	নতি (মি. / কি. মি.)		মন্তব্য	
	আদি	১৯৬১		
মাইথন থেকে বরাকর-দামোদর সঙ্গম	১'১৪	০'৭২২	০'৪৫৬	নতির ক্রম হ্রাস
পাঞ্চেত থেকে বরাকর-দামোদর সঙ্গম	০'৬৪৬	০'৩৯৯	০'২২৮	ঐ
সঙ্গম থেকে দুর্গাপুর খাল	—	০'৫৩২	০'৫৩১	অপরিবর্তিত
দুর্গাপুর খাল	—	০'৫৩২	০'৬৬৫	উচ্চপ্রবাহে বক্ষোন্নতির ফলে আপাত খাত বৃদ্ধি
দুর্গাপুর খাল থেকে রণ্ডিয়া	—	০'৫১৩	০'৩৬১	নতি হ্রাস
রণ্ডিয়া থেকে সুরেকালনা	—	০'৩৬১	০'৩৬১	অপরিবর্তিত

দুর্গাপুর খালের জলবহন ক্ষমতা দশবছরে প্রায় ৩৫% হ্রাস পেয়েছে। তথ্য থেকে দেখা যায় উচ্চপ্রবাহে ১.৬ কি. মি. এ গড় বক্ষোন্নতি ১.৩ মি, ৩.২ কি. মি এ ০.৭৬ মি., ৪.৮ কি. মি-এ ০.৬ মি..... উচ্চবজার সময়ে প্রচুর বালি এখানে জমা হয় (দশবছরে ১২'১১৯ মিলিয়ন টন)। এই বক্ষোন্নতির ফলে প্লাবনতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বী পাড়ের শিলে জলসরবরাহ ব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। চড়া পড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় আগাছা জমানোর ফলে বালি অধঃক্ষেপনের সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে।

নিম্নদামোদরের জলনিকাশী সমস্যার সফটজনক অবস্থাটা আরো ভাল-ভাবে বুঝতে হলে দামোদরের এই অংশের বর্তমান ও পরিত্যক্ত বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সম্যক পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন। খাড়ি, বীকা ও বেহলা নদী দামোদরেরই প্রাচীন খাত বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কিন্তু আজ এই সব নদীগুলির দামোদরের সঙ্গে কোন যোগ নেই—এখন এরা বৃষ্টির জলের নালা। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত শাখাগুলির মধ্যে বেগোরহানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরী পথেই দামোদর নদের অধিকাংশ (৯০%) জল আজ রূপনারায়ণে পৌঁছয়। ১৯৫৫ সালের নিম্নদামোদর অহুস্কান কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন জলনির্গম পথের নিকাশনী ক্ষমতার একটা হিসাব পাওয়া যায়।

বর্তমানে মুচিহানা-মুণ্ডেশ্বরী পথে জলনিকাশের পরিমাণ বেড়ে মোট জলের ৯০% দাঁড়িয়েছে।

### নিম্নহ্রগলীর নাব্যতার সমস্যা :

গঙ্গা ও পদ্মার বিচ্ছিন্নতার পর থেকেই ভাগীরথীর নদীখাতের হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটে চলেছে—ফরাসি দিয়ে জলপ্রবাহিত করে এর নাব্যতা রক্ষা করা যাবে কিনা—এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে। নিম্ন-হ্রগলীর নাব্যতা রক্ষার প্রয়োজন শুধু কলকাতা শহর বা বন্দরের স্বার্থেই নয় সমগ্র ভাগীরথী হ্রগলীর স্বাস্থ্যরক্ষার জুই তা প্রয়োজন। ভাগীরথী হ্রগলীর নাব্যতার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো হল : জলপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি, নদীর সর্পিলা গতিপথ, প্রবাহখাতের অস্থায়িত্ব, দুই পাড়ের ক্ষয় প্রাপ্তি, জোয়ার ও ভাঁটার দুই ভিন্ন প্রণালী পথে আগমন ও নির্গমন, মোহনা মুখে পলি জমা, নদীর বিভিন্ন স্থানে চড়া ইত্যাদি। দামোদর, রূপনারায়ণ ও নিম্নহ্রগলীর সঙ্গমস্থলের নদীগর্ভের বিঘ্নান, জল প্রবাহ এবং পলিপতনের মাঝে এম্বের সম্পর্ক সমস্যাতে জটিল করে তুলেছে। নিম্নহ্রগলীতে পলিজমার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত কপিল ভট্টাচার্য জোয়ারের জলে লাধারণ ঝোলানো পলি ছাড়াও একরকম লাভাজাতিক মণ্ডপলির কথা বলেন। কিন্তু ঝোলানো পলির অধঃক্ষেপনই হোক বা মণ্ডপলি জমে থাকার ফলেই হোক—চড়া মজার প্রক্রিয়া দূর করাই নিম্নহ্রগলীর নাব্যতা রক্ষার প্রধান সমস্যা।

## স্বার্থাধেয়ী মানুষ কি করল :

ওপরের অংশের আলোচনায় আমরা এই অঞ্চলের নদনদীর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি। মানুষের হাতে গড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অঞ্চলের নদনদীর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভারসাম্যের কথা চিন্তা না করেই বিভিন্ন স্বার্থাধেয়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণী স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত নদীকে ঘিরে, নদীর ওপর, নদীকে নিয়ে এমন কতগুলো কাজ করেছে ও করে চলেছে যে সেগুলোর দ্বারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য তার শুধু সেদিন বা আজকের জগই নষ্ট করে ফেলেনি, ভবিষ্যতে এই বিপর্যয় আরও ব্যাপক ও শোচনীয় করে তোলায় লক্ষ্যবনাও বাড়িয়েছে।

## বৃটিশ ভারতে রেলপথ ও স্থলপথ :

বৃটিশ ভারতে বাণিজ্যিক স্বার্থে এবং শাসনব্যবস্থার তাগিদে দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারের প্রয়োজনে, বিশেষত বৃটেনের বিভিন্ন রেল কোম্পানীগুলোর ব্যবসার স্বার্থে (এবং বিশেষ করে লোহাকারবারীদের), ব্যাপক রেলপথ ও স্থলপথ বিস্তারলাভ করতে শুরু করে। তুলনামূলকভাবে জলপথ ও মেচের উন্নয়নের বিষয়টা অবহেলিত থেকে গেছে। ১৮৮২ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জগ্ অর্থব্যয় জলপূর্তের ব্যয়ের সাতগুণ ছিল।\* এর ফলে এদেশের নৌবিভাগ, নৌশিল্প এবং নদীনির্ভর উপজীবিকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সর্বোপরি রেল ও সড়কনির্মাণের স্বার্থে অনেক নদীর অববাহিকার বাধা সৃষ্টি করে নদীর নাব্যতা ধ্বংস করা হয়েছে, রেল সড়ক এবং তাদের প্রয়োজনে বাধ নির্মাণের ফলে জলনিকাশী ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে স্থায়ী জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ ভারতে রেলপথের সম্প্রসারণ এবং তার ফলে নদীব্যবস্থার ওপর যে প্রভাব পড়েছে সেই বিচার বিশ্লেষণ এক বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। এমনকি আজকের রেলপথ ও নদীপথের বিচারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং নদীস্বাস্থ্যের ওপর সড়ক, সেতু ও রেলপথে নির্মাণের হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া যদি আলোচনা করা যায় তাহলেও হয়ত দেখা যাবে যে বৃটিশ রাজের সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নদীস্বাস্থ্যের প্রতি অধিক কোন সুবিচার করা হচ্ছে না।

তার উইলিয়ম উইলককস্ ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায়<sup>১</sup> নির্বিচার বাধনির্মাণ ও রেলসড়কের বেড়াঝালে বাংলার নদনদীগুলির অবক্ষয়ের ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—এই সব রেল ও বাধের তিনি নাম দিয়েছিলেন শরতানের বেড়াঝাল—তার মতে এতে জল ও মাটির মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। অথচ বাংলার নদনদী বিভাগে প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট সমন্বিত এক সুপ্রাচীন সেচব্যবস্থার পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি—তার মতে গঙ্গার স্রাবনজন্য নির্গমের জগ্ যে খালগুলি ছিল তার উন্নতি বা লক্ষ্যবহারের

কোন চেষ্টা ত' হয়নি বরং রেলওয়ে বাঁধগুলি এই খালগুলিকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। এর ফলে অনেক অঞ্চলেই গঙ্গার পলিযুক্ত জল না যেতে পারায় জমি অত্যধিক হয়ে পড়ে। তার ওপরে জলনিকাশী ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে।

প্রায় একশ বছর আগে তার আর্থার কটন বৃটিশ সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেন যে গাঙ্গেয় অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে রেলপথের বিস্তার এদেশের নদী ও সেচব্যবস্থার পক্ষে সর্বনাশের কারণ হবে। কিন্তু নাব্য পথ ও সেচব্যবস্থা নিয়ে তাঁর সামগ্রিক প্রকল্প রেলওয়ে সম্প্রসারণের স্বার্থে বাতিল করা হয়।

এ হিসেবের 'এ প্রবলেম অব্ রিভারস্ ইন বেঙ্গল' বইতেও দেখা যায় যে তিনি রেলপথ ও সড়কের যথেষ্ট বিস্তারের ফলস্বত্বকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে নদীগুলিকে বন্ধ করে দিতে এবং তাদের স্বাচ্ছন্দ্য শোভের পথে বাধা সৃষ্টি করতে রেলপথ এক বিরাট ক্ষতিকারক ভূমিকা পালন করেছে।

১৯০১-২ সালে কোলাঘাট রেলওয়ে পুল তৈরির ফলে রূপনারায়ণের বঙ্গার পূর্ণতর বেগ ব্যহত হয়। এই পুলের জন্ত নদীর মধ্যে নটি পোস্তা (pier) গাঁথা হয়েছিল—এর ফলে সারা বছরের জোয়ার উঠার সঙ্গে বাহিত পলি নদীগর্ভে পতিত হয়ে রূপনারায়ণের খাত অনেক মজে গেছে এবং তারই ফলে নিম্ন জগলীর পলি অপসারণ ক্ষমতাও ক্রমশ কম যাচ্ছে। (১৯৫৯ সালে এই সেতুর এক ফার্ম উত্তরে রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে কলকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের জগ্ আরেকটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত কপিল ভট্টাচার্য্য<sup>২</sup> সে সময় নদীগর্ভে একটিও পোস্তা না গেঁথে ঝোলানো এক সেতুর বিকল্প প্রস্তাব দেন। তাঁর হিসেবে এই বিকল্প প্রস্তাবে খরচ এক কোটির জায়গায় মাত্র ২০ লক্ষ টাকা হত। উপরন্তু এর দৈর্ঘ্য রেলওয়ে সেতুর এক তৃতীয়াংশ হত বলে ঐ অঞ্চলে মূল্যবান চাষের জমিও কম নষ্ট হত।)

রেল ব্যবসায় লাভের প্রবল উৎসাহে বৃটিশ সরকার নাব্যপথের উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেচকার্যের ব্যাপারে নিতান্ত দায়দারী গোছের মনোভাব দেখায়। আর্চার্ণ্ড ওফুল চন্দ্র রায়ের বইতে দেখা যায় যে কলকাতার শহরতলীর জলমগ্নতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এ অঞ্চলে ১৯১০ সালের আগে জল বয়ে যাবার জগ্ সাত-আটটা বহির্গমন পথ ছিল কিন্তু ঐ বছর সেস বিভাগ নৌচলাচলের জগ্ কানীপুর থেকে কুলটি পর্যন্ত একটা খাল খনন করে। উপযুক্ত নাব্যতা সৃষ্টির জগ্ পূর্বের সাত-আটটি বহির্গমন পথ বন্ধ করে এ খাল জোয়ারের নোনা জলে পরিপূর্ণ থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থে সস্তা ও সিধে যোগাযোগের পথ রচনা করাই ছিল উদ্দেশ্য—তাই জলনিকাশী ব্যবস্থার কোন বিবেচনাই করা হয়নি এবং খরচ কমানোর জগ্ অগভীর করেও একে কাটা হয়। ফলস্বরূপ ১৯১০ সাল থেকে এই খাল দু পাশের চাষ

করা ক্ষেতের বিস্তৃত অঞ্চল বহু ও জলবন্দী এলাকায় পরিণত করে। এ ছাড়া কলকাতা পুরী যোগাযোগের জগু হিজলী টাইডাল ক্যানেল ( ১৮৬৮-'৭৩ ), উড়িষ্সা কোষ্ট ক্যানেল ( ১৮৮০-'৮৬ ) কাটার সময় অনেক নিকাশী খাল বুজিয়ে দেওয়ার ফলে তমলুক ও কাঁথির প্লাবন স্থষ্টির কথাও সে লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি 'খামহল' রক্ষার স্বার্থে এবং জমিদারি ফসল রক্ষার স্বার্থে যথেষ্টভাবে বাঁধ দেবার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বিপর্যস্ত করে তাকে হত্যা করার সামিল কাজই হয়েছে।<sup>১১</sup>

সরস্বতী নদীর মৃত্যু বাণিজ্যস্বার্থে একটা নদীকে নষ্ট করে দেবার চরম নিদর্শন। সরস্বতী নদী তীরে সপ্তগ্রাম থেকেই মুসলমান ফৌজদাররা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন—মুলতান, শেরশাহ, ইসলাম শাহ এবং মহম্মদ তুগ্লকের বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে এর নাব্যতা উন্নতির অভিপ্রায়ে কলকাতার নীচে সরস্বতীর মোহনার সাথে হুগলীর প্রবাহপথ জুড়ে দেওয়া হয়। এই বিকল্প নদীপথের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যাতে পতুগীজদের সাথে সজ্জ্বর্ষ এড়িয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ এই নতুন পথে আসতে পারে। কিন্তু এতে সরস্বতীর নাব্যতার উন্নতি ত' হলই না বরং জোয়ারের জলের পলি এবং ভাগীরথী হুগলীর পলি পতনের ফলে সরস্বতী একেবারে মজেই গেল। সম্ভবত ভাগীরথী-হুগলী-রুপনারায়ণের সঙ্গমের জল পরিবহন ক্ষমতার হ্রাস প্রাপ্তির সমস্তার পেছনে উপরে বর্ণিত ঘটনার কিছুটা অবদান আছে।

### ডি. ভি. সি.-র ইতিকথা :

ডি. ভি. সি. গঠিত হবার ইতিকথার<sup>১২</sup> মধ্যে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল। যদিও নিম্ন ও মধ্য দামোদরে অপরিণাম-দর্শী হস্তক্ষেপে এদেশীয় জমিদার বা রাজস্ববর্গ কিছু পিছপা ছিল না। বর্ধমানের মহারাজার জোরদার শাসন ব্যবস্থায় এবং ধনী চাষীদের পলি-সমৃদ্ধ ভূমির লোভে বর্ধমানের নীচের দিকে দামোদরের প্রাকৃতিক বাঁধ (levee) আরও মজবুত ও উঁচু করা হতে থাকল। এতে বাঁকা, গাঙ্গুর, বেহুলা ও কাশানদীর বার্ষিক 'ফ্লাশিং' ব্যাহত হল এবং জননিকাশী ব্যবস্থার অবনতির ফলে বহুর জল প্রতি দশকেই বাঁধ উপচে বা ভেঙ্গে প্লাবন হয়ে ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়িয়েই তুলত। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বিতর্ক উঠেছিল বাঁধগুলো ভেঙ্গে দিয়ে নদীকে আপন পুরোধ পথে চলতে দিলে বরং প্লাবন সমস্যা কমবে কি না? জবাবে ১৮৫৬-৬০ রেলপথ স্বরক্ষণের স্বার্থে দামোদরের বাঁ পাড়ের জমিদারি বাঁধ পুনর্বিগ্ধস্ত এবং শক্তিশালী করা হল। এর ফলে রেলপথ স্বরক্ষিত হল কিন্তু বাঁদিকের নিম্নাঞ্চলে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। আর অতীদিকে যেহেতু রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়াররা জানতেন যে নদীর দু পাড়েই প্লাবন ঠেকানোর মত বড় ও শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণের খরচ সরকার দেবে না, তাই উচ্চবহুর জলের নির্গম পথ হিসাবে তারা দামোদরের দক্ষিণ পাড়ের জমিকেই কাজে লাগাবার

সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮৫৫ সালে সরকার ডান পাড়ের বাঁধ ২০ মাইল ভেঙ্গে দিলেন। ফলে, ১৮৫৬ সালের মোর্টামুটি বহুতেই ডান পাড়ের অঞ্চলে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হল। ১৮২১ সালে ডানপাড়ের সমস্ত বাঁধই ভেঙে দেওয়া হল।

দামোদর ভ্যালি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ( ডিবেন্স ১৮৬৪, হর্ন ১৯০২, অ্যাডাম উইলিয়ামস্ ১৯১৪, গ্রাম ১৯১৮-১৯ ) জলাধারের সাহায্যে বহু নিঃস্রবের কথা ভেবেছিলেন। শুধু এই নয় বহুমুখী প্রকল্পের বিষয়ও তাদের মাথায় এসেছিল। কিন্তু আজকের মতই সেদিনও প্রশ্ন উঠেছিল : দামোদরের প্লাবন নিয়ন্ত্রণে যে বৃহৎ জলাধার প্রয়োজন তার খরচ এবং সেই প্রকল্প থেকে সেচ ও নাব্যতার উন্নতিতে যে লাভ—তাতে পোষাবে কি না? বলাবাহুল্য সাম্রাজ্যবাদীদের তাতে পোষাত না। লণ্ডনের নেক্রেটারিয়েটের প্রতিক্রিয়া ছিল স্পষ্ট : 'বিবেচ্য প্রকল্প গৃহীত হলে চরম অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।'

কিন্তু এরপর এল ১৯৪৩ সালের বহু। ১৪ই জুলাই বিকেলের দিকে আশানসোলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ১৬ই জুলাইয়ের ২৪ ঘটায় ১১" বৃষ্টিপাত হয়। ১৬ই মাররাতে বর্ধমানের ৭০ মাইল নীচে ৩'৫ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়। গত তিন বছরের তুলনায় এই বহুর তীব্রতা বরং কমই ছিল বলা চলে। কিন্তু এবারে দামোদরের উত্তর পাড়ে একাংশ গেলো ভেঙ্গে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ, জি. টি. রোড বিধ্বস্ত হয়ে গেল। যে শাসকগোষ্ঠী বহু নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনের প্রশ্নটি দেশের ভূসম্পত্তির ক্ষতি, ফন্দের বিনষ্ট, জননিকাশী ক্ষমতা হ্রাস, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এবং সর্বোপরি জীবননাশের পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কানেই তোলেনি, এবার তারাই কিন্তু দামোদরের প্লাবনে বিচলিত হয়ে উঠল। কারণ হল যুদ্ধকালীন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ :

১। বর্মার যুদ্ধে মিত্রশক্তির অবস্থা ছিল সঙ্গী এবং এই রেলপথ ভেঙ্গে যাওয়ায় কোয়টিনথ আমি হেডকোয়ার্টার থেকে এগার সপ্তাহের জগু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যুদ্ধের দৌলতে দামোদর সর্বভারতীয় সমস্যা হিসেবে হাজির হল।

২। শুধু মিলিটারি সাপ্লাইয়ের ব্যাপার নয়—বাংলায় দুর্ভিক্ষের ফলে পাঞ্জাব গম রেলপথে আমদানি করা হচ্ছিল প্রতিদিন ১০৬ ওয়াগন ভর্তি করে। মেইন লাইন ভেঙ্গে যাওয়াতে খড়গপুরের লাইনের ওপর প্রচুর চাপ পড়ছিল।

এবারে শাসকদের তৎপরতা দেখার মত। গভর্নর কেনি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ( আসলে সেটা ছিল পূর্বোল্লিখিত ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাবের সামান্য অদলবদল ) পাঠিয়ে দিলেন লর্ড ওয়াভেলের কাছে। ওয়াভেল নির্দেশ পাঠালেন টেনেভ্যালি করপোরেশন বিশেষজ্ঞ ডুডুইনকে আমন্ত্রণ জানাবার—১৯৪৬ সালে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন গঠিত হল।

ডি. ভি. সি.র ইতিকথার বিবরণ থেকে একটা সত্য পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে—বর্ধমানের মহারাজা, পুরোধ জমিদারগে গী থেকে শুরু করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সকলেই—কখনও কৃষির স্বার্থে, কখনও রেলপথ বিস্তারের স্বার্থে, কখনও যুদ্ধকালীন সরবরাহ বজায় রাখার স্বার্থে নদী-ব্যবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে প্লাবন প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

### বৃটিশোত্তর যুগের গোষ্ঠীস্বার্থে বিপন্ন জনস্বার্থ:

দামোদর বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্য দামোদর ঘিরে মহত্ব কৃতকর্মের হিসেব নিকেশ নিলে দেখা যায় যে একটা নদীকে ঘিরে দেশি রাজা, জমিদার থেকে ইংরেজ শাসক এবং সবশেষে এই যুগে ধনী ভূস্বামী, প্রভাব-শালী ব্রিটনদের নদীভিত্তিক কাজ কর্মগুলোর মধ্যে এক ধরনের নদী স্বাস্থ্যহানিকর এবং জনস্বার্থবিরোধী কাজের ধারাবাহিকতা আছে। পুরোধো দিনের দামোদরের একপাড়ের বাঁধের মতই আজও কিন্তু নিম্ন দামোদরের সমস্ত অসুবিধা বটেছে নদীর অর্ধাংশে বন্যাবিরোধী 'জ্যাকেটিং' ব্যবস্থা থাকার ফলে। এ জগৎ স্বাভাবিকভাবেই বাকি অর্ধেক উন্মুক্ত পাড়ের অংশে প্লাবন প্রকোপ প্রবলতর হয়েছে। আমতা, আরামবাগ, ময়না ও দাসপুরে বন্যার বহুপরেও দীর্ঘস্থায়ী জলমগ্নতার এও একটা কারণ। আধাখাধি জ্যাকেটিং এর চেয়ে বরং একেবারেই না থাকা তবু ভাল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মজয় নদকে ঘিরে বিচ্ছিন্ন বন্যাবিরোধী জ্যাকেটিং ব্যবস্থা মাঝে মাঝে নেওয়া হয়েছে—তার ফলে অরক্ষিত অংশে বন্যাবিধ্বংসের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। একই কথা জলপাইগুড়ির বেলায়ও খাটে। সেখানে তিস্তার বাঁ দিকের পাড় সুরক্ষিত করা হয়েছে। এসবই হল আঞ্চলিক গোষ্ঠীস্বার্থের ব্যাপার।

অসংখ্য নদীমালা বিধৌত এই দেশের সভ্যতা মূলত নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সেজ্ঞ এই সভ্যতা কৃষপ্রধানও বটে। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকে মুঘল আমলে সেচকার্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। বৃটিশরা মোটামুটি সেই ট্রাডিশনই বহন করে চলে। হুতিফ নিবারণে সেচ-কার্যের উন্নতির জগৎ ইংরেজের যত না মাথাব্যথা ছিল তার চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল তুলাচাষের জগৎ। ভারত সরকার স্বাধীনতার পর সেচকার্যের জগৎ বহু প্রবল গ্রহণ করে তার অত্যন্ত কারণ হল ভারতবিশ্বভাগের পর সেচখালে চাষ করা জমির বেশির ভাগই পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। (পাকিস্তানের সেচখালের জলের পরিমাণ ছিল ৮১,৪০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং ভারতের ১১,১০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। মেচাধীন ভূমির ক্ষেত্রফল ছিল যথাক্রমে ৮০ লক্ষ হেক্টর এবং ২০ লক্ষ হেক্টর)।

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বড় বড় জলাধার প্রকল্প নেওয়া হয়—ময়ূরাক্ষী, দামোদর উপত্যকা, কংসাবতী জলাধার। এর ফলে খারিফ ও রবিশস্ত চাষের জগৎ সরবরাহে চাষের উন্নতি হয়েছে ত্রিকই কিন্তু খরচ ও উপকারের অল্পপাতে অসংখ্য কত দাঁড়ায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ

আছে। এ ছাড়াও স্বাধীনতা উত্তর যুগেও ভূপ্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে বিচার বিবেচনার চেষ্টাও নেই—এমনকি একটা নদীর জল-মিকালী ব্যবস্থাকে পর্যাপ্ত সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করা হয় না। উচ্চ উপত্যকা, নিম্ন উপত্যকা এরকম আলাদা আলাদা করে বিচার বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়াও বৃটিশ রাজের নগরভিত্তিক উন্নয়ন চিন্তার অভ্যাসের জোরের সাথে যেন যুক্ত হয়েছে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্বার্থাধেষী গোষ্ঠীর আঞ্চলিক স্বার্থ পূরণের চাহিদায় নদী ও সেচব্যবস্থার ওপর খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন হস্তক্ষেপের কুফল। এর ফলে বন্যা প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে:

(১) পশ্চিম মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর ডান দিকের পাড়ে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বাঁধ (levee)—দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, কোপাই ইত্যাদি নদীকে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ডান পাড়ের গ্রামাঞ্চলে নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়—আগে এই বিল ও হিজলের পথেই বন্যার জল নিকাশ হত। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি কিছু প্রভাব-শালী ধনী চাষী এই বিলগুলোর চারধারে মজবুত বৃত্তাকার বাঁধ দিয়ে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ আরম্ভ করে। এর ফল হল বন্যার জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া।

বীরভূমে অজয় নদীর গতিপথের ওপরও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে— আঞ্চলিক গোষ্ঠীস্বার্থ পূরণের চাহিদায়। এর একমাত্র স্বার্থ উচ্চফলনশীল গম এবং বোরো ধানের চাষের সবুজ বিপ্লব থেকে মুনাফা লোটার।

(২) ডি. ভি. সি.র ওপর একটি রিপোর্ট<sup>১০</sup> থেকে দেখা যায় যে গত শতাব্দীর অবহেলার ফলে দামোদরের হীনাবস্থার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সংঘাত। 'ফদলের প্রাচুর্যের স্বার্থে কেউ চায় পলিপতন যেমন বর্ধমানে বাঁধ (bund) নয়, আবার কেউ চায় বাঁধ—বালির স্তূপ নয়।'

(৩) এমনকি গোষ্ঠীস্বার্থ এমন পর্যায়ে উঠেছে যে জলাধারের জল-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলিও এদের স্বার্থেই পরিবর্তিত করা হয়। উচ্চফলনশীল বোরো চাষের জগৎ সর্বোচ্চ পরিমাণ জল যাতে পাওয়া যায় সেজ্ঞ জলাধারের জলের উচ্চতা অনুমোদিত নীমার ওপরে পর্যাপ্ত রাখা হয়। সাধারণত এই জল রাখা হয় ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই অক্টোবরের মধ্যে। বলা হয় এ হল বন্যা প্রকোপের সম্ভাবনাকে সূচনিতভাবে প্রশমিত করার ব্যবস্থা!<sup>১১</sup>

অপরদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের জল ও জলবিহ্যতের সহৃদেয় নিয়ে গড়া ডি. ভি. সি.র বাঁধগুলো বন্যার সর্বোচ্চমাত্রা প্রশমনে সাহায্য করলেও নদীর ওপর এই প্রকল্পের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। মৈত্র ও চ্যাটার্জীর মতে<sup>১২</sup> ডি. ভি. সি. প্রকল্প চালু হওয়ার আগের ও পরের অবস্থার তুলনা করলে দেখা যায় যে ডি. ভি. সি. কার্যকরী হবার পর থেকে জুলাই-আগষ্ট মাসে নদীপ্রবাহের ৫০% জল সরিয়ে নেওয়ার ফলে

নিয়ন্ত্রণমোহরে মোটামুটি বড় রকমের বন্যপ্রবাহ লক্ষনীয়ভাবে কমলেও এতে নদীর জল পরিবহনক্ষমতা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

খাও, বাসস্থান, শিল্প ও ব্যবসার তাগিদে এদেশের মানুষ উচ্চপাহাড়ী অঞ্চল থেকে শুরু করে নিচে হুন্দরবন পর্যন্ত এলাকায় নদনদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগাতে প্রয়াসী হয়েছে। হুন্দরবন অঞ্চলে বাঁধ ও ভেড়ি নির্মাণ করে চাষ-আবাদের ফলে ঐ অঞ্চলে ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশের 'পরিপত' অবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। কুলটি, পিয়ালি, বিজ্ঞাধরী, মাতলা প্রভৃতি নদী ক্ষত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অগ্রদিকে উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল প্রসারের প্রয়োজনে এবং কাঠ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে চাষাবাদ এবং বসতি স্থাপনের তাগিদে অনেকক্ষেত্রে ব্যাপক বনাঞ্চল উচ্ছেদের অপরিণামদর্শিতায় ভূমিক্ষয় বৃদ্ধির পরিমাণ বেড়ে উঠেছে, সাথে সাথে জমির জল শোষণ করার ক্ষমতাও কমে গেছে। এর ফলে নদীতে বাহিত পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে নদীগর্ভে পলিপতনের হারও বেড়ে যাচ্ছে—এই কারণে মোহনার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মাত্রাও ক্ষততর হচ্ছে। এর ওপর আবার কিছু তুল বন্যরোপন প্রকল্পের ফলে হিতে বিপরীত হবার উপক্রম ঘট—যেমন, শাল গাছের পরিবর্তে ইউক্যালিপ্টাস পুঁতে বনস্থাপনের নজিরও আছে। প্রথমোক্তটি গ্রন্থপঞ্জী :

- ১। মনুস্কম অ্যাণ্ড রেনফল প্যাটার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড : এল.এ. রামদান (মোটেন্টেনস অ্যাণ্ড রিভার্স অব ইণ্ডিয়া : সম্পাদিত বি. সি. ল : গ্রাশনাল কমিটি ফর জিওগ্রাফি, কলিকাতা ১৯৬৮)
- ২। ভাগীরথী-হুগলী বেসিন : সত্যকাম সেন (ঐ)
- ৩। জি ভাগীরথী-হুগলী, এ ফিউ রিমার্কস : এন. কে. বোস (জি ভাগীরথী-হুগলী বেসিন : সম্পাদিত কাননগোপাল বাগচী : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২)
- ৪। স্ট্যাটিস্টিক্যাল হাণ্ডবুক : ডি. ভি. সি. (১৯৭৪-৭৫)
- ৫। ডি. ভি. সি.—কেন, আরও কী করা যায় : অনিমেষ রায় : (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, অক্টোবর, ১৯৭৮)
- ৬। ডি. ভি. সি. অ্যাণ্ড ফ্লাডস : লং টার্ম কোশ্চেনস্ : দীপাঙ্কন রায়চৌধুরীর নোটস থেকে (ব্যক্তিগত আদানপ্রদান), ১৯৭৮
- ৭। উদ্ধৃতির সূত্র : ডেনেজ্ স্ট্যাডি অব লোয়ার দামোদর ভ্যালি—২ : সত্যকাম সেন (ইণ্ডিয়ান জর্নাল অব প্যাণ্ডার অ্যাণ্ড রিভার ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট, ভলুয়াম ৭, নম্বর ৫, মে ১৯৫৭)
- ৮। বাংলাদেশের নদনদী ও পরিবহন : কপিল ভট্টাচার্য (বিশ্বাচার্য লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৫৯)

জলীয়বাশ ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে কিন্তু শেবোক্তটি জলীয় বাশ ছেড়ে দেয়।<sup>১০</sup>

ওপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা সাধারণভাবে এটাই দেখানোর চেষ্টা করলাম যে কিভাবে বিদেশী শাসকদের স্বার্থাধেবী উচ্চাঙ্গলি এবং তার পরেও এদেশীয় স্বার্থাধেবী গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ নদনদী ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ও সজীবতার হানি ঘটিয়ে বন্যা বিধ্বংসের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা উত্তর যুগের সবচেয়ে কল্যাণমূলক নদীপ্রকল্প হিসেবে খ্যাত দামোদর উপত্যকা যা এদেশে বহুমুখী উপত্যকা প্রকল্পের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত যাকে স্বাধীনতা উত্তর যুগে এদেশের নদনদীর ওপর সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিতর্কিত হস্তক্ষেপ বলা যেতে পারে তাকে ঘিরে এই '৭৮ এর বন্যার পরে আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে, প্রস্তাব, প্রতি-প্রস্তাব এসেছে—এই প্রবন্ধে আলোচিত সাধারণ পটভূমিকার পরি-প্রেক্ষিতে এবং '৭৮ এর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সংখ্যায় আমরা সেই ডি. ভি. সি. এবং ফরাক্কি ব্যারেজ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করব।

অমল লোম  
পার্শ্ব সেন  
কুমারেশ মিত্র

- ৯। দেশের কথা (পৃ ২১) : সখারাম গণেশ দেউসর : সাহিত্যলোক : পূর্বমুদ্রণ (১৩৭৭)
- ১০। উইলিয়াম্ উইলকক্ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতামালা : ১৯৫৭
- ১১। লাইফ অ্যাণ্ড এক্সপিরিয়েন্স অব এ বেঙ্গলি কমিটি, ২য় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছদ : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় : (১৯৩৫)
- ১২। নিউ ইণ্ডিয়াজ্ রিভার্স : এইচ. সি. হার্ট ; ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৫৬
- ১৩। এ কেস্ স্ট্যাডি অব জি ভি. সি. অ্যাণ্ড ইট্ প্রোজেক্টস (স্বাভ কন্ট্রোল সিরিজ নং ১৬)—ইউ. এন. ইকনমিক কমিটি ফর এশিয়া অ্যাণ্ড ফার ইস্ট, ব্যাংকক, ১৯৬০
- ১৪। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্লাডস্ : সত্যেশ চন্দ্র চক্রবর্তী ও বৌদায়ন চট্টোপাধ্যায় : ইকনমিক টাইমস্ : ১৩-১৪ নভেম্বর, ১৯৭৮
- ১৫। বেড্ ডিকমেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল দামোদর অ্যাণ্ড জি রূপনারায়ণ জিউ ই কনস্ট্রাকশন অব মাল্টিপারপাস রিসার্ভারস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যালি—বি. মৈত্র অ্যাণ্ড এ. সি. চ্যাটার্জি : সি. বি. আই কর্নাল : ভলুয়াম ৫৩, নং ১ (১৯৬৬)

# সিমেন্সের খপ্পরে ভেল (BHEL)—বিকাশের পথে না বিনাশের ?

[ The recent tie-up of BHEL with Siemens has been critically examined. Some problems of Science and Technology in this country, as highlighted by the tie-up, have been briefly presented ]

বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে শিল্পায়নের প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে সাময়িকভাবে কারিগরী আমদানীর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়া যায় না। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে, সেই কারিগরী আমদানীর ফাঁক দিয়ে বিদেশী শক্তি বা বহুজাতিক সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা যেন কোনমতেই না বেড়ে ওঠে, স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। অবশ্য এ দেশের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্পরকম। স্বয়ংনির্ভরতার চক্কামিনাদে গত ত্রিশ বছর কান বালাপালা হলেও অভিজ্ঞতা বলে, বিদেশের কাছে আমাদের খপ আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে, দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে আজ বিদ্রিত। ঠিক এমন সময়ে অগ্রতম সরকারী সংস্থা ভারত হেলি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (BHEL) এর সাথে পশ্চিম জার্মানীর বহুজাতিক সংস্থা SIEMENS এর সাম্প্রতিক কারিগরী চুক্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। যেহেতু প্রশ্নটি এ দেশের বিজ্ঞান-গবেষণার ভবিষ্যৎ ও দেশীয় অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে আছে, সেই গুরুত্ববোধে এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য নীচে রাখছি।

## BHEL সর্ববৃহৎ তৃতীয় সংস্থা :

বিনিয়োগের পরিমাণের দিক দিয়ে ভারতে BHEL এর স্থান তৃতীয়। মূলতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অগ্রাঙ্ক শিল্পের জন্ম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি BHEL তৈরী করে। BHEL এ নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় 55,000; এর মধ্যে রয়েছেন 13,000 ইঞ্জিনিয়ার ও 25,000 দক্ষ শ্রমিক। BHEL এর সম্পদমূল্য প্রায় 500 কোটি টাকা।

## বিবিধ কারিগরী চুক্তি :

ষাটের দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অগ্রাঙ্ক ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি BHEL তৈরী করা শুরু করে। BHEL-এর ভূপাল, তিরুনি, হায়দ্রাবাদ আর হরিদ্বারের কারখানাগুলি তৈরী হয় রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ব্রিটেনের সাথে বিভিন্ন কারিগরী চুক্তি মারফত। এই চুক্তিগুলির অধিকাংশই ষাটের দশকের শেষভাগে শেষ হয়। এরপর কতকগুলি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের জন্ম চুক্তি করা হয় আমেরিকা ও

যুরোপের বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে। বর্তমানে BHEL পশ্চিম জার্মানীর SIEMENS এর সাথে দীর্ঘমেয়াদী কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই চুক্তিগুলির মেয়াদ পনের বছরের, প্রয়োজনবোধে তা বাড়িয়ে পঁচিশ বছর করা যেতে পারে। অর্থাৎ আগামী শতকের প্রথমভাগেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে আমাদের বিদেশী কারিগরী আমদানীর ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে।

## SIEMENS-এর সাথে চুক্তি :

১৯৭৬ সালে অধিক মাত্রাসম্পন্ন (200MW—1000MW) turbine তৈরী করার জন্ম BHEL সীমেন্সের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। বর্তমানে সোভিয়েত ডিজাইনের 200MW turbine BHEL তৈরী করে, বিদেশ থেকে এর কোন সামগ্রীর আমদানী ছাড়া। সুতরাং শুধুমাত্র 200MW turbine সীমেন্সের ডিজাইন অনুসারে তৈরী করতে হলে বর্তমান উৎপাদন যন্ত্রগুলির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। এর জন্ম খরচ পড়বে আনুমানিক 50 কোটি টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চুক্তি সম্পাদন কালে BHEL কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বাবদ 5 কোটি টাকা খরচ পড়বে বলে জানিয়েছিল।

## এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল কী ?

মূলতঃ যে কারণে চুক্তিটি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অহঙ্কৃত হয়েছিল, তা হল অনিয়মিত বাজার। ভারতের মত দেশে যে কোন শিল্পসংস্থার পক্ষে এই সংকট স্বাভাবিকভাবে আসবে। BHEL কর্তৃপক্ষ প্রথমে এই সংকট কাটাতে চেয়েছিলেন রপ্তানী মারফত। কিন্তু তা সংকট কাটাতে সহায়তা করল না। সুতরাং এর প্রতিকার হিসাবে তারা কারিগরী আমদানীর সহজ পিচ্ছিল রাস্তাটি বেছে নিলেন।

বর্তমানে BHEL 200MW শক্তির turbine তৈরী করে হরিদ্বারের কারখানাটিতে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাও অর্জন করেছেন BHEL এর বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা। সুতরাং 200MW শক্তির turbine এর ক্ষেত্রে নতুন করে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

উপরন্তু, ১৯৭৩ সালে BHEL কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে 500MW শক্তির turbine তৈরী করা প্রয়োজন

এবং বেহেতু বর্তমানে BHEL এর 500MW শক্তির turbine তৈরীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কারিগরী দক্ষতা নেই, তাই এই ব্যাপারে বিদেশী কারিগরীর আমদানীর প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাথে অবশ্য একথা বলা হয়, Acquisition of design knowhow would, therefore be necessary. Participation of BHEL'S team of designers in the design effort and acquisition of basic data and support computer programmes from the collaborator will have to be ensured under this arrangement. This would enable BHEL'S design teams to develop the designs of the next higher capacity set, say 750 or 800 MW on their own, as by then R & D laboratory facilities which are so essential, would have been set up by BHEL and be fully operative."

সুতরাং শুধুমাত্র 500 MW শক্তির turbine এর জন্ম বিদেশী কারিগরী আমদানীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়, বেহেতু প্রয়োজনীয় দক্ষতা তখনও অর্জিত হয় নি।

কিন্তু পরবর্তীকালে চুক্তি সম্পাদনের পর দেখা গেল, শুধু 500 MW শক্তির turbine নয়, 200 MW থেকে 1000 MW শক্তির সমস্ত মাত্রার turbine এর জন্ম বিদেশী কারিগরীর ওপর নির্ভর থাকতে হবে আমাদের।

তবু তাই নয়, এই চুক্তির ফলে BHEL এর এই মুহূর্তে কী পরিমাণ ক্ষতি হ'ল তার একটা খতিয়ান দেখা যাক।

BHEL কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে 200 MW শক্তির turbine এর order পেয়েছেন। সীমেন্সের সাথে চুক্তি অসম্বন্ধী, যতদিন পর্যন্ত BHEL, সীমেন্স-কারিগরী অনুসারে 200 MW শক্তির turbine তৈরি না করবে, তার আগে KWU থেকে BHEL, পনেরটি সেট কিনবে। (KWU সীমেন্সের অধীনস্থ সংস্থা) KWU এর এই শক্তিসম্পন্ন turbine এর দাম প্রায় ৩ কোটি টাকা। এর সাথে বিভিন্ন শুষ্ক বাবদ খরচ মিলিয়ে খরচ পড়বে 12 কোটি টাকার মত। বর্তমানে BHEL এর তৈরী 200 MW শক্তির turbine এর দাম প্রায় 6.4 কোটি টাকা। BHEL কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে 6.4 কোটি টাকা মূল্যের turbine দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ যদিও BHEL কর্তৃপক্ষ মধ্যপ্রদেশ বিদ্যুৎ পর্ষদকে জানিয়েছে, তারা KWU থেকে দুইটি 200 MW শক্তির turbine দেবে। সুতরাং, শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে BHEL কর্তৃপক্ষের প্রায় 12 কোটি টাকা

ক্ষতি হবে। যেন রাখা প্রয়োজন, ভারত সরকারকে এর জন্ম প্রায় 16 কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা খরচ করতে হবে, যদি ধরা হয় turbine সেটগুলির জাহাজে আনার সময় কোন অতিরিক্ত খরচ না হয়।

উপরন্তু রয়েছে, এই সেটগুলির যন্ত্রাংশের প্রস্তুতি। এটি খুব পরিষ্কার এই যন্ত্রাংশ এই মুহূর্তে BHEL এর তৈরী করার প্রস্তুতি ওঠে না। সুতরাং এর দাম নিয়ে দর কষাকষির ক্ষেত্রে BHEL এর বিশেষ কোন ভূমিকা থাকবে না।

এই চুক্তি সম্পাদনের সময় জানান হয়েছিল, 500 MW শক্তির turbine এর প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ১৯৮০ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে। চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে। এর পর দুটি বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে এক ধাপও এগোয়নি। অগ্রগতি কারণ ছাড়াও এই বিলম্বের অন্যতম কারণ 500 MW শক্তির turbine এর বাজার নাকি তেমন আশাপ্রদ নয়।

সুতরাং বাজার সম্প্রসারণের দোহাই দিয়ে যে ক্ষতিতার সাথে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল, সেই মুক্তির সারবত্তা কতখানি তা অস্বপ্নের।

**গবেষণার ভবিষ্যৎ :**

ভারতের অন্যতম সরকারী সংস্থা ECIL এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর Vijaykar কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেছেন, এই চুক্তির ফলে দেশীয় গবেষণার ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি জানিয়েছেন, এ দেশের বিজ্ঞানীদের প্রয়াসে ECIL, datalogging এর জন্ম বিবিধ যন্ত্রপাতি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তিতে সীমেন্সের ভারতীয় জুটি SIEMENS INDIA-কে ঐ একই যন্ত্রপাতি তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র ECIL-এর ক্ষেত্রেই নয়, BHEL এর নিজস্ব গবেষণার মূলে কুঠারাঘাত করল এই চুক্তি। BHEL-এ প্রায় 3000 জন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার গবেষণার কাজে রত রয়েছেন। 20 কোটি টাকা ব্যয়ে হায়দ্রাবাদে নতুন গবেষণাগার গড়ে উঠেছে। কিন্তু সম্পাদিত চুক্তির ফলে অদূর ভবিষ্যতেও এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ল।

ভারতের মত দেশে যেখানে স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার সব স্বযোগই রয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানকর্মীরা সংখ্যায় পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানে, সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার কাছে এ ধরণের আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত যদি গড়ে না ওঠে, তবে বিজ্ঞানগবেষণার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই থাকবে, অর্থনৈতিক পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে মুক্তির আশা হবে স্বদূর পরাহত।

—অন্ততাব খান

(এখানে ব্যবহৃত সমস্ত তথ্যই লোকসভা সদস্য পি. রামমূর্তির BHEL-SIEMENS চুক্তি সম্পর্কিত পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়েছে।)

## এনসেফেলাইটিস

বর্তমানে এনসেফেলাইটিস এই শব্দটি আমাদের কাছে বিভীষিকার মত। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি জেলা ও কুচবিহারে এই রোগের কবলে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, অনেকে নারাজীবনের মত সার্বিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই রোগটি আমাদের দেশে এই প্রথম নয়। বহুদিন ধরেই আছে—এই প্রথম এত বাড়াবাড়ি দেখা গেল।

এনসেফেলাইটিস প্রথম মহামারী হিসেবে দেখা দেয় ১২২৪ সালে জাপানে। এছাড়াও চীন, কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়, থাইল্যান্ড, দিবাণুরেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সাধারণত গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই এই রোগ দেখা যায়। শীতের শুরুতে এই রোগের প্রকোপ কমতে থাকে। এই রোগটি একটি বিশেষ ধরণের ভাইরাসের ফলে দেখা দেয়—যার নাম আর্থেভাইরাস বা জাপানী এনসেফেলাইটিস, এই ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রকে ধ্বংস করে। আবার এনসেফেলাইটিসের বিভিন্ন ভাইরাসের মধ্যে তফাৎ রয়েছে তাদের গঠনে এবং কর্মক্ষমতায়। বিভিন্ন ভাইরাসের প্রোটিন শৈলীর বিভ্রান্তে সামান্য রদবদলের জন্য তাদের এই তফাৎ—এরা একেটি ভাইরাস স্নায়ুতন্ত্রের একেটি বিশেষ অংশে-নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। আমাদের দেশে যে ভাইরাসটি দেখা যায় তা বিশেষ করে ধ্বংস করে স্নায়ুতন্ত্রের একটী পিরামিডাল সিস্টেমকে এবং পার্কিন্স নাম এক ধরণের কোষকে।

এই ভাইরাসটির বাহক হচ্ছে এক ধরণের মশা যার নাম কিউলেগ্‌স্‌ বিম্বুই। এই মশা ছিম পাড়ে ধানক্ষেতে, নোংরা পচা ডোবায়, গোময় ও গোমুত্রে। সাধারণত গ্রীষ্মের দিকেই এই মশার প্রাদুর্ভাব বেশি, শহরতলীর যে সমস্ত অংশে ধানক্ষেত ও পচা নাল-ডোবা ইত্যাদি আছে সেখানেও এরা বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এই রোগের কবলে পড়ার সতর্কতা গ্রাহ্যের লোকদেরই বেশী। শহরাঞ্চলেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে কারণ শহরে ও এই মশার পুষ্টির পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়া রয়েছে। এই ভাইরাস সাধারণত ধারণ করে গবাদি পশু, ছাগল, জেয়ার, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি প্রাণী। মাছের দেহে এই ভাইরাসটি বাহক মারকং বাসা রাখে—যদিও মশা-গবাদি পশু-মশা এই জীবন বৃত্তটি সাধারণত অস্পৃশ্য হয়। তা হলেও যেখানে খাটাল বা জেয়ার পালন হয়, পচা ডোবা, নাল ইত্যাদি আছে সেখানে এই রোগ ছড়িয়ে পড়া আশ্চর্য ব্যপার নয়। সাধারণত এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করার আগে সেই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত

লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে থাকে। এর ফলে হঠাৎ হঠাৎ কোথাও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুহার অস্বাভাবিক রোগের তুলনায় অনেক বেশি প্রায় শতকরা ১৫ থেকে ৪০ জনের মত। এ বছর জুন মাস থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কম করে ১৬০০ জন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলায় ৫৩২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কুচবিহার জেলায় এক সপ্তাহে এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত ১২ জন ব্যক্তিই মারা যান। এই রোগে বয়স্কদের তুলনায় শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হন। বিশেষজ্ঞদের মতে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। ১২৫৫ সালে দক্ষিণাত্যে এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া থেকে আজ পর্যন্ত এই রোগের প্রকোপ অব্যাহত আছে—কোথাও কোথাও কখনও তা মহামারীর আকার ধারণ করছে।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচণ্ড মাথা ও ঘাড় ব্যথা হবে, প্রচণ্ড জ্বর হবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমনকি ১০৪°-১০৫°F, বমি হবে এবং রোগী ক্রমশঃ অচেতন হয়ে পড়বে। আগেই বলা হয়েছে এই রোগে মৃত্যু হার প্রায় শতকরা ৪০ শতাংশ। আবার সেরে উঠলেও রোগী নারাজীবনের মত জড়বুদ্ধিমত্তা, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। এ ছাড়াও তার নানাবিধ সার্বিক রোগ দেখা দিতে পারে। শুক্রাণু, পথ্য ও পরিচর্যা ছাড়া এই রোগের এখনও কোনো ওষুধ নেই। তবে জাপানী এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি প্রতিষেধক টিকা আছে। সম্প্রতি এই নিয়ে গবেষণা চলছে—তবে ভাইরাস ধ্বংসকারী ওষুধ মানুষ এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। আমাদের দেশে এই বিষয়ে গবেষণার কাজ প্রায় হচ্ছেই না বললে চলে উপরন্তু প্রতিষেধক টিকা তৈরি করার ব্যাপারে ভারত সরকারের আশ্চর্যজনক উদ্যোগে সচেতন মানুষ মাত্রই বিস্মিত বোধ করছে। সরকারের মতে এই প্রতিষেধক টিকা তৈরির প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশের মধ্যে সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে। এছাড়াও পূর্বাঞ্চলে স্থল অব উপকাল মেডিসিন ছাড়া অন্য কোন সংস্থা নেই যেখানে এই বিষয়ে গবেষণা হতে পারে। যাই হোক, এ বিষয়ে গবেষণা ও টিকা তৈরির প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে জনস্বাস্থ্যের অবহেলিত দিকটিতে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করতে হলে পানাপুকুর, পচাডোবা, নর্দমা-নালী মাক রাখতে হবে,

খাটালগুলিতে বাস্তুকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তা হলে মশার পুঙ্গন ধ্বংস করা যাবে এবং এই দুরারোগ্য ব্যাধির বাহক কিউলেকসকে পরাজিত করা যাবে। চাই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, উৎসাহ ও উত্তম। মাহুস অনেক জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধিকে এই ভাবে জয় করেছে—তার নতীর সৃষ্টি করেছে

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন। আমরাও নিঃসন্দেহে এই রোগকে চিরন্তনে দূর করতে সক্ষম হব যদি জনবাস্থ্য নীতি প্রকৃতই জনমুখী হয়ে ওঠে।

শান্ত্রী সিংহ চৌধুরী  
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

## টেস্টিউব বেবি বিতর্ক : কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য

কলকাতার তিন চারজন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর মিলিত চেষ্টায় বিশ্বের দ্বিতীয় টেস্টিউব বেবির জন্ম সম্ভব হয়েছে এই মর্মে খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে সেটি অবশ্যই হবে আমাদের জাতীয় গৌরব। বিজ্ঞানীদের গবেষণা শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার একটি নিঃসন্দান দম্পতি তাঁদের দীর্ঘবাহিত সন্তানলাভ করেছেন। সুতরাং ফলের দিক থেকে বিবেচনা করলে ঘটনাটি অবশ্য স্তম্ভের ইংগিত।

কিন্তু কলকাতার চিকিৎসক সমাজের এক বড় অংশ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নানা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ শিশুটি সত্যি সত্যিই 'টেস্টিউব বেবি' কিনা এ সম্পর্কে তাঁদের গভীর সংশয় রয়েছে এবং তাঁরা এ ব্যাপারে হয়তো কিছু প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন তোলায় কোন আপত্তি থাকার কথা নয়—যদি প্রশ্ন তোলা ব্যাপারটি লুৎতেশূলক হয় এবং সঠিক পন্থায় সূক্ষ্মভাবে বৈধসহকারে তা উপস্থিত করা হয়। কিন্তু কলকাতার চিকিৎসক সমাজেরই সংখ্যা কর্তৃক আহৃত একটি সম্মেলন কিন্তু এখানেই ব্যর্থ হয়েছে—যার ফলে তাঁদের উদ্দেশ্যের সঠিকতা বা বিকৃতি নিয়ে সাধারণ্যে নানা ভিজাসা জন্মেছে। একটি কথা মনে রাখা এখানে বিশেষ প্রয়োজন : বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের পদ্ধতিতে অসম্পূর্ণতা সব সময়েই থাকতে পারে এবং যে কোন মুহূর্তে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কার্যকর পক্ষেই সম্ভব নাও হতে পারে কারণ বহু প্রশ্নের শেষ মীমাংসাই আনুসঙ্গিক অগ্রান্ত নানা বিষয়ের জ্ঞানের অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল। এর জন্ম প্রয়োজন বৈধ সহকারে গবেষণাকার্য পরিচালনা করার মত সময়, সুযোগ বিজ্ঞানীদের দেওয়া—হেঁ হেঁ করে মতা তেঁকে দাবীদারদের হেনস্থা করার কাজ হানিল করা নয়। আপাতদৃষ্টিে একটু কটু শোনাতেও আরেকটি কথা এখানে উল্লেখ্য : বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পেশাগত সাফল্যলাভ করা আর সে বিষয়ে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ হওয়ার মধ্যে ফারাক অনেক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এখন এত দ্রুত ও বিশেষায়িত (Specialised) হয়েছে যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের সঠিকতা বৈঠিকতা সম্পর্কে শেষ রায় দেওয়ার অধিকার একমাত্র সেই শাখা বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সং বিজ্ঞানীদেরই (অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার নিরূপণে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়)।

টেস্টিউব বেবি-সম্পর্কিত ঘটনাটি বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত তার নাম Reproductive Engineering. যতদূর জানা গেছে যে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সরাসরি গবেষণাভিজ্ঞতা কলকাতার কারুরই প্রায় নেই। সুতরাং এদের বিচারকের আঙ্গনে আঙ্গীন হবার যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন ও সংশয় না তুলে পারিনা।

আমাদের পরবর্তী বক্তব্য—বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ বিষয় প্রকাশনার পদ্ধতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে। বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়বস্তু, আমাদের মতে, ধারাবাহিকভাবে নিষ্ঠাতরে বিজ্ঞানের বিশেষায়িত পত্রিকাগুলোতেই প্রথম প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রচার মনস্ক হয়ে তাড়াহড়ো করে এ ব্যাপারে বাজারী পত্রিকার ঘাংহ হওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জনমানসে নানা প্রাতকুল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। জনগণ সাধারণভাবে এগুলোকে Stunt বা প্রচার সর্বস্বতা বলে উড়িয়ে দিতেই অভ্যস্ত। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার সত্যাসত্য সম্পর্কে বিচার তো এসব ব্যবসালোভী পত্রিকামালিক ও সাধারণ সাংবাদিকদের ধারা সম্ভব নয়। কিছু কিছু জরুরী বিষয় ক্ষততার সঙ্গে প্রকাশের ক্ষমতা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় Letter Journal রয়েছে। সেগুলোকে ষথায়থ ব্যবহারের চেষ্টা করাও বিজ্ঞানীদের কর্তব্য। এ ব্যাপারে কিছু পদ্ধতিগত ক্রটির জন্মই বর্তমানে কলকাতার টেস্টিউব বেবির জন্ম নিয়ে এক অবাঞ্ছিত উত্থাপ সৃষ্টি হয়েছে। একথা ঠিক যে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক গবেষণা বিষয় অনেক সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। সন্দেহে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া অবশ্য-করণীয় কিছুই থাকে না। তবে নানা দিক বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্টকালীন গোপনীয়তা আমরা সাধারণভাবে সমর্থন করি।

এবারে আসা যাক বিষয়টির প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে। ভিত্তিহীন দাবী এর আগেও অনেক বিজ্ঞানী অনেক ক্ষেত্রেই করেছেন—তা স্বদেশেও, বিদেশেও। পরবর্তীকালীন গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক দাবীর সঠিকতা নিরূপণে সরকার কোথাও তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন এমন নজির আমাদের জানা নেই। নজির নেই

বলেই তা শুরু করা যাবে না এমন কথা বলছি না। যা বলতে চাই তা হল এক্ষেত্রে তা ঘটানোর কোন রকম প্রয়োজনই ছিলনা। ঘটনাটি অদূর বা সূদূর ভবিষ্যতে কুফল প্রদায়ী কোন ব্যাপারে দাঁড়াতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকলেও সরকারী পদক্ষেপের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অগ্ররকম ভাববার সুযোগ থাকত। ব্যাপারটিকে তাই আমরা বৈজ্ঞানিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অবাধিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। প্রথমত কমিশন গঠনেই আমাদের তীব্র বিরোধিতা রয়েছে—পরবর্তী প্রশ্ন হল কমিশনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ততা সম্পর্কে। কলকাতার টেইটিউব বেবি-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক শাখা প্রশাখাগুলো হল Endocrinology, Gynaecology, Genetics এবং Cryogenics, কিন্তু এই প্রাসঙ্গিক বিভাগ-গুলোর মধ্যে এমাত্র Gynaecology ছাড়া অল্প কোন বিষয়ের সঙ্গে দূর্বতম সম্পর্কের কোন ব্যক্তি কি সরকার নিযুক্ত কমিশনে ছিলেন? তাহলে এ বিষয়ের কোন সিদ্ধান্তে পৌছবার পেশাগত ও নৈতিক অধিকার তাঁদের আদে কোথেকে?

দামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য আমরা নীচে সোজাসৃজি ভাষায় রাখছি **প্রথমত**—কলকাতার টেইটিউব বেবি-র জন্মের সঠিকতা সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য করতে চাই না—কারণ তা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। **দ্বিতীয়ত**—কলকাতার চিকিৎসকদের একাংশ ঘটনাটি সম্পর্কে সেরকম অবৈজ্ঞানিকমূলত আচরণ করেছেন আমরা তা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করি। **তৃতীয়ত**—ঘটনাটির প্রতি সরকারের বিজ্ঞানবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপন্থারও আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। প্রতিক্রিয়াশীল অন্ততশক্তির চাপের কাছে নতিস্বীকার ছাড়া সরকারী পদক্ষেপের কোন সংগত ব্যাখ্যা নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস। **চতুর্থত**—অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে কখনো কোন তদন্ত

কমিশন গঠিত হলে সেখানে বিজ্ঞানীদের কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়া উচিত হবে কিনা সে সম্পর্কেও তাঁদের ভাবনাচিন্তা শুরু হবার সময় এনেছে। **পঞ্চমত**—ভবিষ্যতের কোন বৈজ্ঞানিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞানীরা ভুলক্রমেও যেন বাজারী পত্রিকার দ্বারস্থ না হন—এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দিক থেকেই কঠোর সতর্কতা অবলম্বনও আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। **ষষ্ঠত**—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আহুত সম্পদ যাতে ব্যবসায়ী সংবাদপত্র-মালিকদের লাভ ও লোভের খোরাক না হয় সেদিকে বিজ্ঞানীদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষাগত নানা ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রচার মাধ্যমগুলির অন্তত চাপস্বষ্টির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অপকৌশল, নানা প্রচলিত ভীতি প্রদর্শন প্রচেষ্টা বানচাল করে দেওয়ার পথ সম্পর্কেও ভাবনাচিন্তা আজ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

পরিশেষে আরেকটি কথা। অতিরঞ্জিত দাবী বিজ্ঞানীরা কখনো করেন না তা নয়—বরং অনেকসময়ই করেন এবং সুবদেশেই। কিন্তু এদেশের জল হাওয়ার এব্যাপারে একটা অন্তত রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আছে। হঠাৎ একদিন প্রভাতী পত্রিকায় একজন বিজ্ঞানীর চমক সৃষ্টিকারী কোন আবিষ্কারের দাবী ঘোষিত হল। তারপরে বৈজ্ঞানিক পথে তার সত্যতা-সত্যতা যাচাই হওয়ার আগেই দেখা যায় নানা দাঙ্কিতশীল পদে প্রতিষ্ঠিত করে সরকার বাহাদুর তাঁকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করছেন। ব্যাপ — প্রতিষ্ঠার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে যায়—অথচ আবিষ্কারের অষ্টরঙা! ব্যক্তিবিষয়ে কটাক্ষ করতে চাই না বলেই এখানে নামোল্লেখ বর্জন করা হ'ল। কিন্তু এটা বন্ধ হওয়া দরকার। বিজ্ঞানী তথা বুদ্ধিজীবীদের অকারণ নিগ্রহ যেমন বন্ধ করা দরকার তেমনি অযৌক্তিক অগ্রগৃহ প্রদর্শনের ও শেষ হওয়া উচিত।

এস. ভট্টাচার্য

For your requirement of any custom built electronic equipment :

**VARCAS**

26, Rameshar Shaw Road, Calcutta-700014

Phone : 44-1104 (Fact.), 47-4942 (Resi.), Telex 021-2459

Works : 2-D, Ghosal Street, Calcutta-700019

Sequence timer, logic systems, counters, frequency meters, blinkers, timers, P-H meters, Photo-electric switches & controls etc.

## ত্রিবাঙ্গমে বিজ্ঞানকর্মীদের সম্মেলন

আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগের সংকট কাটিয়ে বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে, সমাজ ও জীবনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রত রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সংস্থা। এই সংস্থাগুলি একত্রে যদি সমাজ, প্রকৃতি ও জীবনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে এদেশের সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে, যদি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার মূল অন্তরায়গুলি চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে পারে, তবে তা এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক শক্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে। এই বোধে কেরলের "শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ" গত ১০ই থেকে ১২ই নভেম্বর ত্রিবাঙ্গম শহরে তিনদিনব্যাপী "নিখিল ভারত জন-বিজ্ঞান আন্দোলন" শীর্ষক এক কনভেনশনের আয়োজন করেছিলেন। এই কনভেনশনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় এক শত প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। পঃ বাংলা থেকে গিয়েছিলেন পঃ বঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বীক্ষণ, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পঃ বঙ্গ শাখা, পঃ বঙ্গ সরকারের Science and Technology Committee'র প্রতিনিধিরা। অত্র প্রদেশ থেকে যে সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, সেইগুলি হল : মহারাষ্ট্রের সায়েন্স এডুকেশন্স গ্রুপ, শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, শ্রমিক সংগঠন, ভূমিসেনা, ভীমশক্তি সেনামণ্ডল আর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন; কর্ণাটকের সায়েন্স সার্কেল, গ্রাম বিকাশ মণ্ডল, আশা (ASHA), আর ASTRA; মধ্যপ্রদেশ থেকে বিদ্যুৎ কারখানা, কিশোর ভারতী, দিল্লীর সি, এস, আই, আর সোনাইটি অফ ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারস্; তামিলনাড়ুর অ্যাসোসিয়েশন অফ দি প্রমোশন্স অফ সায়েন্স এডুকেশন এবং কেরল থেকে শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, প্রোগ্রাম অফ কমিউনিটি অর্গানাইজেশন ও সি, এস, আই, আর রিজিওনাল কমপ্লেক্স।

পারম্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় ছাড়া মূলতঃ চারটি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল : ১। ফর্ম্যাল ও নন-ফর্ম্যাল শিক্ষা, ২। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা, ৩। জন-স্বাস্থ্য আন্দোলন, ৪। সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে বিজ্ঞান। স্থানিষ্ঠ আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয়ের ওপর একটি করে "খীন্ পেপার" দেওয়া হয়েছিল। এই আলোচনার সারাংশ নিচে রাখছি।

ফর্ম্যাল শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় সবাই একমত ছিলেন যে, প্রচলিত

শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের দরিদ্র মানুষদের প্রায় স্পর্শ করতে পারেনি। উপরন্তু শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবহার যোগাযোগ সীমিত হওয়ার শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের বিশেষ কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি। তাই লবাই একমত যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হবে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে সকলের পক্ষে আবশ্যিক হতে হবে, সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যসূচী। এছাড়া বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতিরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। ব্যক্তির স্বকীয় দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশলাভের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী কিছু সংস্থা (যেমন মধ্যপ্রদেশের "কিশোর ভারতী") ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় কিছু কাজ করেছেন।

যেহেতু এ দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ আজও শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, সুতরাং আজ সবচেয়ে জরুরী তাদের কাছে পৌঁছানো। নন-ফর্ম্যাল শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এই অর্থে পরিষ্কৃত। নন-ফর্ম্যাল শিক্ষার উদ্দেশ্য চিবিধ : ১। বয়স্ক ও শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা, ২। ফর্ম্যাল শিক্ষার কাঠামোর বাইরে সমাজের ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। যেহেতু এক্ষেত্রে তথাকথিত ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক নেই, তাই শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে "অভিও ভিজুয়াল" মাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মহারাষ্ট্রের "সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ" বোম্বাই নগরীর বস্তি-সমস্যা "Slides" এর মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরার সাফল্যজনক দৃষ্টান্ত রেখেছেন। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী সকলেই নন-ফর্ম্যাল শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

"জন-স্বাস্থ্য আন্দোলন" শীর্ষক আলোচনাচক্র এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, ভারতের বর্তমান স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাগুলি কার্যতঃ জনসমষ্টির এক ক্ষুদ্রাংশের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। ওষুধের চড়া দাম, বহুজাতিক সংস্থাগুলির বাজার নিয়ন্ত্রণ একদিকে করেছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চিকিৎসার সুযোগ, অল্পদিকে দেশীয় ঔষধশিল্প গড়ে তোলার পথে গড়ে তুলেছে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর। তাই দেশের অধিকাংশ মানুষকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা "জন-স্বাস্থ্য আন্দোলনের" প্রধান লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন এবং এই কর্মসূচী

প্রশ্নের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন। সেই সাথে খেরাল রাধা দরকার গ্রাম ও শহরের প্রয়োজনগত পার্থক্য।

“বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান” শীর্ষক আলোচনাচক্রে সবাই একমত যে, বর্তমানে বিজ্ঞানগবেষণার যে ধারা এদেশে চলছে—তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বতরাং এই চরিত্রের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটতে হয় তাহলে শুধুমাত্র ল্যাবরেটরীর চৌহদ্দের মধ্যে গবেষণা নয়, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দ্রুত ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজনে ও সাধারণ মানুষের এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে, তার সাথে বিজ্ঞানকর্মীদের পরিচয় প্রয়োজন বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতির স্বার্থে। দেশের শিল্পায়নের স্বার্থেই প্রয়োজন ক্ষয়ক্ষতি শিল্পগুলির বিকাশ ঘটান ও সেগুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা। যেহেতু সমাজ কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন না করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তাই কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির মতে বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিজ্ঞানকর্মীদের যোগাযোগ গড়ে ওঠা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর বিজ্ঞানকর্মীদের পারস্পরিক মতামত ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষণার ধারাটি গড়ে উঠবে। যদিও বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা আলাদা ধরণের, তবু এ দেশের মূল কতকগুলি সমস্যা, যেমন বাসস্থান, স্বাস্থ্য, ক্ষয়ক্ষতি শিল্প, domestic energy ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার কার্যক্রম প্রশ্রয়নের কথা ভাবা যেতে পারে।

সমাজবিপ্লবে বিজ্ঞানের ভূমিকা কী হতে পারে, তাই ছিল কনভেনশনের শেষ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়। ভারতে যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে মানুষের স্বার্থে প্রয়োগের ব্যাপারে প্রায় কিছুই করা হয়নি, সেখানে বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে হতাশার ভাব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানকর্মীদের তরফ থেকে মানুষের স্বার্থে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কল্পে তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন প্রয়াস গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই উদ্যোগগুলি যদি সাথে সাথে অর্থনৈতিক সামাজিক বিকাশের প্রতি-বন্ধগুলির বিরুদ্ধে চালিত না হয়, তবে মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে “কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের” কর্মকাণ্ডের সপ্রশংস উল্লেখ করা হয় এবং এদের কাঠামোর মধ্যে সমাজ-বিপ্লবের স্বার্থে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কনভেনশন থেকে স্থির হয়েছে, কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী সংস্থা-গুলির পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্ত বোম্বাই থেকে ইংরেজী

[ জিবাশ্রমে বিজ্ঞানকর্মীদের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা থেকে সূত্রত পাল ও অংশগ্রহণ খান প্রতিনিমি হিসাবে গিয়েছিলে। তাঁরা “বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী”র জন্ত এই রিপোর্ট তৈরী করেছেন। ]

“সমাজ বিপ্লবের জন্ত বিজ্ঞান” এই আদর্শকে সামনে রেখে “কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের” বিবিধ কর্মপ্রয়াস সেখানকার জনজীবনে অকৃতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। পনের বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির আজ সদস্য সংখ্যা ছয় হাজার আর কেরলের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে প্রায় দেড়শ শাখা। ইতিমধ্যেই পরিষদ প্রায় পাঁচশ “গ্রাম শাস্ত্র সমিতি” (Village Science Forum) গঠন করেছেন—লক্ষ্য প্রতি গ্রামে একটি করে সমিতি গঠন।

লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শতাধিক বই মালয়ালম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত প্রকাশিত হয় পাঁচটি মানিক পত্রিকা। ত্রিচুর থেকে শিল্পের জন্ত “ইউরেকা”, জিবাশ্রম থেকে লোকপ্রিয় বিজ্ঞান-পত্রিকা “শাস্ত্র কেরালাম”, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জন্ত কালিকট থেকে “শাস্ত্রগণি”, ক্যান্যানোর থেকে গ্রামের মানুষের জন্ত “গ্রামশাস্ত্রম্” আর কোট্টায়াম থেকে গ্রামের মানুষ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেগুলির গ্রাহক সংখ্যা লক্ষ্যের দিক দিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

১৯৭৩ সালে পরিষদের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞানের এক প্রচার অভিযান চলে সারা কেরল জুড়ে, যার মূল বিষয় ছিল “বিজ্ঞান ও সমাজ”। লক্ষাধিক মানুষ বারশ ক্লাশে এইসব আলোচনার অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে “প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও সমাজ” শীর্ষক দশ হাজার আলোচনা সভায় পনের লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই “কেরলের সম্পদ” বিষয়ে পাঁচ হাজার ক্লাশ লংগঠিত হয়—অংশগ্রহণ করেছিলেন আট লক্ষ লোক। মানুষের বৈজ্ঞানিক অহমত্বস্বা জাগিয়ে তোলার জন্ত ১৯৭৭ সালে এক অভিনব প্রচার অভিযান চলে এক মাস জুড়ে। এক “জীপ জাঠা” কেরলের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে—আটশ পঞ্চাশটি আলোচনা সভায় পাঁচলক্ষ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।

ভাষায় একটি ত্রিমাসিক পত্রিকা “Newsletter” প্রকাশ করা হবে। ইতিমধ্যে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

এই মুহূর্তে যখন হতাশার অন্ধকারে এদেশের এক বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞানকর্মী নিমগ্ন, তখন বিভিন্ন প্রদেশের ছড়িয়ে থাকা সংস্থাগুলির এক জায়গায় মিলিত হওয়া নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াস একসূত্রে গ্রথিত হয়ে ভবিষ্যতে এক শক্তিশালী আলোচনায় পরিণত হবে, এই প্রত্যয়ের অধীকার ছিল এই কনভেন-শনের মূল সূত্র।

থেকে সূত্রত পাল ও অংশগ্রহণ খান প্রতিনিমি হিসাবে গিয়েছিলে।

## সংস্থা সংবাদ

**সাম্প্রতিক বহু প্রসঙ্গে :** বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্যরা সকলেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথান্য চেষ্টা করেছেন বহুয় দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। সংস্থা নিজে কোন আর্থিক পরিচালনা না করলেও সদস্যদের মাধ্যমে কয়েকটা ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করেছে। এছাড়া রাজ্যব্যাপী আর্থিক বিপন্ন প্রচেষ্টায় আমাদের সংহত প্রকাশের নমুনা হিসাবে ষড়মাঘ ২১১ টাকা সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দিতে পেরেছে। তবে সংস্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শুধু ত্রাণের মাধ্যমে সমস্যার কোনরকম সমাধান সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সৃষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে বহুয় স্বাস্থ্য প্রতিকার সম্ভব আর তার পথে সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিবন্ধগুলো কোথায় তা চিহ্নিত করার জন্য সংস্থার অলোচনাচক্র উপসমিতির ব্যাংস্থাপনায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে গত ১৬ই ডিসেম্বর দ্বারভাঙ্গা হলে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন কাননগোপাল বাগচী, গিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস, সুরজিত গুহ, কপিল ভট্টাচার্য, দেবেশ মুখোপাধ্যায়, অনীম দাসগুপ্ত, রাধানাথ ঘোষ, ও সুহাস চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই বক্তব্য রাখেন। সভার কাজ পরিচালনা করেন জয়ন্ত বসু, বিনায়ক দত্তায় ও ক্ষেত্র প্রসাদ মেননসর্মা। সংস্থা ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও যৌথ প্রচেষ্টা চালাতে আগ্রহী।

**মুখপত্র :** সংস্থার মুখপত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার আর্থিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে সংস্থার সদস্যদেরকে অহরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন সকলে পত্রিকার গ্রাহক হন। এর মাধ্যমে সদস্যদের সঙ্গে সংস্থার কাজকর্মের যোগাযোগ বাড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

**বিজ্ঞান আন্দোলন :** সংস্থা মনে করে যে একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্যেই আমাদের সমস্ত কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আর উৎপাদনের কাজে বিজ্ঞানের ব্যাপক আর সৃষ্টি প্রয়োগই হবে এই আন্দোলনের আদর্শ, কিন্তু সংস্থার সামর্থ্য ও সংগঠন আপাতত অত্যন্ত সীমিত। এই সামর্থ্য নিয়ে আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি তা খতিয়ে দেখে একটা সম্ভাব্য কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরি করার উদ্দেশ্যে সোমেন গুহকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে একটা উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। উপসমিতি

প্রথমে বিভিন্ন উৎসাহী সংগঠন, গোল্ডি ও ব্যক্তির কাছে এক আবেদন রাখে। এই আবেদনের প্রাথমিক অংশ পত্রিকার এই সংখ্যায় উদ্ধৃত করা হচ্ছে। আবেদনের পর উপসমিতির তরফ থেকে কিছু সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনাও করা হয়েছে। আমরা উপসমিতির কাছ থেকে এবারের সংস্থার চিন্তাভাবনা সংগঠিত করার মতো একটা বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করার কথা ভেবেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, কেবলে বিজ্ঞান আন্দোলনের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে; এর জন্য 'কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' নামে সংগঠনটি বিশেষ সাফল্য দাবী করতে পারে। সম্প্রতি এঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনে আগ্রহী সংগঠন আর ব্যক্তিদেরকে এক সম্মেলনে জড়ো করেছিলেন। সংস্থার তরফ থেকে তাতে প্রতিনিধি ছিলেন সুরত পাল ও অংশুতোষ খান। এঁদের রিপোর্ট পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

**সাধারণ সভা :** গত ২২শে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট সংস্থার সাধারণ সভা ডাকা হয়। সংস্থার আলোচনাচক্র, বিজ্ঞান আন্দোলন আর মুখপত্র বিষয়ক উপসমিতির আহ্বায়করা এই উপসমিতি-গুলোর বিগত কাজকর্মের রিপোর্ট আর মেসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর আলোচনা রাখেন। সংস্থার সম্পাদক সাময়িকভাবে সংগঠনের কাজকর্মের মূল্যায়ন আর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন সংস্থা বা অঞ্চলে সংগঠনের ইউনিট গঠনের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আলোচিত হয়। উপস্থিত সদস্যগণ সংগঠনের কাজকর্মের বিষয়ে তাঁদের আলোচনা সমালোচনা রাখেন। সভা পরিচালনা করেন সংস্থার সভাপতি প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

**কার্যকরী সমিতির অধিবেশন :** মোটামুটিভাবে প্রতি মাসের ১০ তারিখ সংস্থার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসে থাকে। গত কয়েক মাসের অধিবেশনে সংস্থার বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। জানুয়ারী ('৭৯) মাসের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের কাছে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের গতি-প্রকৃতি-সমস্যা বিষয়ে একমাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে অহরোধ জানানো হবে। কেরলার ত্রিবাঙ্কুরে মর্বভারতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোম্বাই থেকে যে News letter প্রকাশিত হচ্ছে, সংস্থা তার নিয়মিত গ্রাহক হবে এই মর্মেও একটি সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়।

**বিভিন্ন সংগঠন ও বিজ্ঞানকর্মীদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ  
বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার আবেদন :**

বিজ্ঞানকে সমাজসুখী বা সমাজকে বিজ্ঞানসুখী করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৭ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মীগণস্থা (Scientific Workers' Forum) গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জগৎ প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা একটি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অহুত্বব করেছে।

সমস্ত রকম বিজ্ঞান কর্মীদের সামাজিক চেতনা বাড়ানো এবং জীবন চিন্তার আদান প্রদান, স্থানীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সম্ভাব্য সমাধানের প্রচেষ্টা, জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং কুৎসার দূর করার প্রচেষ্টা এই বিজ্ঞান আন্দোলনের অগ্রতম উদ্দেশ্য।

এ সম্পর্কে কিছু সংগঠন ও ব্যক্তির সাথে প্রাথমিক আলোচনার

আমরা জেনেছি—বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে আছে।

কিন্তু আমরা অহুত্বব করি—বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন উদ্যোগগুলোকে সমন্বিত এবং সংহত করা বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রয়োজন। বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনাগুলো কেমন ও কতখানি, কর্মসূচী কেমন হবে, কাজ করার অভিজ্ঞতা কি রকম প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে আমরা যোগাযোগ ও আলোচনা করতে চাই। প্রাথমিক পরে উৎসাহী সংগঠন ও ব্যক্তিদের যোগাযোগ ও আলোচনার জগৎ আমরা আহ্বান করি।

**সৌমেন গুহ**

**আহ্বায়ক :** বিজ্ঞান আন্দোলন উপসমিতি,  
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা

২৪ অক্টোবর, ১৯৭৮

For all Electrical, Electronic Components and Equipments and  
any other odd items

Please Contact :

**D. S. ENTERPRISES**

52/9C, B. B. Ganguly Street, ( 1st floor ),

Calcutta-700 012

( We also Supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cylinders of various  
capacities ; Silica & Quartz tubes of different sizes )

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অতিথি লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক ৫২/৯সি, বি. বি. গাঙ্গুলী  
স্ট্রীট, কলি: ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রাকর শ্বেস, ১০/১সি, মায়হাটা ডিউ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।